ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ।। ১৭ শ্রাবণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৩ আগস্ট, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

সীমাহীন তোষণ

আরও তিন মুসলিমকে মন্ত্রী করছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুসলিম তোষণের ধারা অব্যাহত রেখে সিপিএম রাজ্য মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকজন মুসলমান মন্ত্রী করতে উদ্যত হয়েছে। সেইসঙ্গে সরকারে এখন যে সব মুসলমান মন্ত্রী রয়েছেন, তাঁদেরও আরও 'উন্নত' পদে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে সিপিএম। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কমিটিতেও মুসলিমদের স্থান সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে শিক্ষক, ডাক্তার, পুলিশের চাকরিতে যাতে আরও বেশি করে মুসলিমদের নিয়োগ করা যায় সেজন্য অলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পর সিপিএম রাজ্য মন্ত্রিসভায় বড় রদবদল করবে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে রাজ্য কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সম্ভবত বিদ্যুৎ মন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে শারীরিক অসুস্থতার জন্য মন্ত্রিসভা থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্যের দায়িত্বে থাকা সূর্যকান্ত মিশ্রের বোঝাও হালকা হওয়ার সম্ভাবনা। পঞ্চায়েত, দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্কিম ঘোষকেও অব্যাহতি দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। পরিবর্তে পশ্চিম মেদিনীপুরের নাজমুল হক, উত্তর দিনাজপুরের মাফুজা খাতুন, বীরভূমের কামরে ইলাহি, পুরুলিয়ার নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সম্ভাব্য মন্ত্রী হিসাবে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে যাঁরা বাদ পড়ছেন বা যাঁদের দায়িত্ব ছাঁটা হচ্ছে তাঁরা সকলেই হিন্দু। আর নতুন করে আগামী দেড় বছরের জন্য যাঁদের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে বা দায়িত্ব বাড়ানো হচ্ছে তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান। সিপিএমের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মুসলমানদের মন পেতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সরকার। আব্দুল হালিম, মহম্মদ সেলিম, রেজ্জাক মোল্লা, মহম্মদ মসিই, আব্দুস সাত্তারের মতো মুসলমান নেতাদের যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুসলিমরা যাতে সরকারি চাকরিতে সহজেই ঢুকতে পারে, সেজন্য সমস্ত সরকারি নিয়োগ কমিটিতে মুসলিম প্রতিনিধি রাখা হচ্ছে। কারণ, মুসলিমদের নাকি অভিযোগ ছিল, যোগ্যতা থাকলেও নিয়োগ কমিটিতে মুসলিম দেখলেই তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়। সেই কারণেই নিয়োগ কমিটিতে মুসলমান সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার।

মন্ত্রী রয়েছেন
রেজ্জাক মোল্লা, আনারুল হক, আব্দুস সাত্তার, আনিসুর রহমান, মোর্তাজা হোসেন।
হতে চলেছেন
নাজমুল হক, মাফুজা খাতুন, কামরে ইলাহি।

মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দাঙ্গা

হিন্দুদের ওপর হামলার ছক স্পষ্ট

গুরুপুরুষ ।। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা খোলার জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই ব্যয় বরাদ্দ প্রথম আর্থিক বছরের জন্য। এরপর ধাপে ধাপে প্রতি বছর কেন্দ্র আলিগড়ি শিক্ষার জন্য টাকা দেবে। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা কি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পায় না? অথবা আলিগড়ি শিক্ষার মান এতটাই উচ্চ যে একমাত্র সেখানে পড়লেই জন্ম সার্থক হয়। আমার জানা নেই যে মুর্শিদাবাদ জেলাসহ রাজ্যের অন্যত্র মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দাবিতে গণ আন্দোলন করেছে। এমনকী লোকসভা নির্বাচনের সময় মুর্শিদাবাদের মুসলিম ভোটদাতারা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপনের জোরদার দাবি প্রণববাবুর কাছে জানিয়েছে তেমনও নয়। তবে কী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রণববাবু এই ঘোষণা করেছেন? কেন? ভোটের লোভে?

গত ১০ জুলাই মুর্শিদাবাদের ঝাউবোনা ও ত্রিমোহিনী এলাকায় এবং তার আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর থানার গোড়ের হাটে বিনা প্ররোচনায় একতরফাভাবে হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির উপর যে আক্রমণ চালানো হয় তার একটি স্পষ্ট ছক আছে। এই দুটি ক্ষেত্রেই মুসলিম ছাত্ররা হিন্দু গরিষ্ঠ এলাকায় স্কুলের ভিতর প্রতি শুক্রবার দুপুরে নামাজ পড়ার দাবী জানিয়েছে। এই দাবী স্কুল কর্তৃপক্ষ না মানলে দাঙ্গা বাধানো হয়। দেশভাগের পর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা দাবি জানিয়েছিল যে ভারতের সর্বত্র মুসলিম ছাত্রদের প্রতি শুক্রবার দুপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নামাজ পড়ার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষা যেহেতু রাজ্যের বিষয় তাই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যবস্থা নিতে বলে। অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে যে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই প্রতি শুক্রবার দুপুরে বিদ্যালয়গুলিতে এক ঘন্টা ছুটি রাখা হতো মুসলিম ছাত্রদের নামাজ পাঠের জন্য। তখন অবশ্য বিদ্যালয়ের ভিতরেই নামাজ পড়ার দাবি জানানো হয়নি। এবার যা হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সাম্প্রদায়িক দাবী প্রথম উঠেছিল। এই ব্যাপারে বিশদ প্রতিবেদন পাওয়া যায় স্যার আগা খাঁনের লেখা, ''মেমোয়ারস্ অব আগা খাঁন'' বইটিতে। আগা খাঁন স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তান গঠনের কৃতিত্ব মহম্মদ আলি জিন্নার নয়। এই কৃতিত্ব অবশ্যই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের। ''স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম প্রথম হয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে''। এই ঐতিহাসিক মন্তব্য স্বয়ং আগা খাঁনের। একই কথা বলেছিলেন কায়েদ-ই-আজম জিন্না সাহেব। দেশভাগের ঠিক আগে জিন্না আলিগড়ে এসে শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, ''আপনাদেরই চিন্তা, ধারণার ফসল পাকিস্তান রাষ্ট্র''। দেশভাগের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সাহিদ সুরাওয়ার্দি কলকাতার তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে লেখা একটি চিঠিতে লেখেন — ''ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের কর্তব্য নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলা। এর

(এরপর ৪ পাতায়)

দক্ষিণ বারাসতে মুসলিম দুস্কৃতীদের হামলা

সংবাদদাতা ।। গত ২৬ জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দক্ষিণ বারাসত মহামায়া সিনেমা হলে 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে' ছবির ৩য় শো দেখার জন্য টিকিটের লম্বা লাইন পড়ে। কয়েকজন মুসলিম যুবক টিকিট কাউন্টারে জড়ো হয়ে অনেকগুলো টিকিট সংগ্রহ করে চড়া দামে বিক্রি করছিল। সন্তু দাস নামের একজন যুবক লাইন থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানাতেই সেখ মুজিবর, সেখ সইদুল, আলি হোসেন-সহ অন্যান্য মুসলিম যুবকরা তাকে ধরে মারতে থাকে। এই ঘটনায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন সন্তু দাসকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে। এদিকে মুসলিম যুবকরা ফোন করে লোক ডাকতে শুরু করায় স্থানীয় হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে হাতাহাতি, লাঠালাঠি এবং তারপর ছুরি, বোমা-বন্দুক নিয়ে শুরু হয় ধর্মোন্মাদ মানুষের লড়াই। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়নগর-কুলতলি-এর চেয়ারম্যান গৌর সরকার গুরুতর আহত হন। উভয়পক্ষের প্রায় ৯ জন জখম হন। এলাকায় প্রবল উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ ও র‍্যাফের যৌথ টহলদারি চলছে।

গো-রক্ষা হলেই দেশ রক্ষা হবে - রাঘবেশ্বর ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গোরক্ষা হলেই এদেশ রক্ষা পাবে। এটাই একমাত্র রাস্তা। মহারাজ এই বক্তব্য দক্ষিণের গোকর্ণপীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শংকরাচার্য শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী মহারাজের। সম্প্রতি চাতুর্মাস্য উপলক্ষে কলকাতায় অবস্থান কালে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। গোরক্ষা হলে ধর্ম-সংস্কৃতির রক্ষা হবে। এর থেকে বড় কোনও সাধন আর নেই। একসময় চরকার মাধ্যমে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। চরকা থেকেও গো-মাতার ক্ষেত্র অনেক বড় এবং ব্যাপক, এর মাধ্যমে সারা হিন্দুস্থানকে যুক্ত করা সম্ভব। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন, আস্তিক, নাস্তিক সবার জন্য গাভী উপকার প্রদায়িনী। যদি কেউ আস্তিক হন — রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা দেবীর উপাসক হন অথবা শিখ, জৈন, বৌদ্ধ আর্য সমাজীও হন, তাঁরা সকলেই গোরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

গোমূত্র থেকে অনেক রোগ দূর হয়। এমনকী ভবিষ্যতে যদি পরমাণু যুদ্ধ হয় তাহলে তার ফলে যে বিকীরণ হবে তারও সমাধান গো-জাত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে। শরীরে গোবরের প্রলেপ বিকীরণের প্রতিক্রিয়া থেকে মানব শরীরকে রক্ষা করতে পারে। আজ পর্যন্ত এর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। সারা ঘরে গোবরের প্রলেপ পরমাণুর ভয়াবহ বিকীরণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ। কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক দ্রব্য ভক্ষণ করে কেউ জীবন-ধারণ করতে পারে না। জীবন ধারণের জন্য (আনাজ) ফসল আবশ্যক। ফসল ফলানোর গোরু আবশ্যকতা অনিবার্য। হরপ্পা মহঞ্জোদড়োর যুগেও গোরুর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একবিংশ শতাব্দীতেও তাই রয়েছে।

প্রসঙ্গত, শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী মহারাজের প্রেরণা ও মার্গদর্শনে ১০৮ দিন

(এরপর ৪ পাতায়)

পশ্চিম উপকূলে হামলার আশঙ্কা পরিকাঠামো গড়ে ওঠনি এন এস জি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮-এ মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর প্রায় আট মাস হতে চলল। যেটুকু খবর পাওয়া গেছে ভারত এখনও ওই ধরনের এক বা একাধিক হামলা প্রতিহত করার জন্য যে রকম বাহিনী, তাদের জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা দরকার তা যোগাড় করে উঠতে পারেনি। এরই মধ্যে আবার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশকে ২৬ জুন গোয়েন্দা বিভাগ লিখিতভাবে জানিয়েছে যে, পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী লস্কর-এ তৈবা ভারতের পশ্চিম উপকূলে একই ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেছে। পশ্চিম উপকূলের গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং গোয়া সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য। বাণিজ্যিক এলাকা, বেড়ানোর স্থান এবং বিশেষ নির্দিষ্ট সংস্থায় আঘাত করে পুঁজি বিনিয়োগকারী এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদেরকে ভয় পাওয়ানো অন্যতম উদ্দেশ্য। এলাকা হিসেবে পশ্চিমের মাণ্ডবি ও কচ্ছের কোটেশ্বর বন্দরের (গুজরাট) উল্লেখ রয়েছে। ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, পাক-সন্ত্রাসবাদী সংস্থা লস্কর এ তৈবা তাদের ভারতীয় এজেন্টদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে যে হামলা করার ক্ষেত্র এবং লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা বা গোপন ডেরা ঠিক করার জন্য। এমনকী অস্ত্রশস্ত্র পরিবহনের জন্য যন্ত্রচালিত নৌকার বন্দোবস্ত করারও নির্দেশ রয়েছে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী দলগুলির দুই শীর্ষনেতা হাফিজ সৈয়দ এবং মুম্বাই হামলার মাস্টারমাইণ্ড জাকিউর রহমানকে এখন গৃহবন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

(এরপর ১৫ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রসারে ভারত উদ্যোগ নিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারত সরকার এবার ভারতের চিরাচরিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতিকে ব্যবহারিক ও পদ্ধতিগত দিক উন্নত করতে চলেছে। বিশেষ করে, 'পঞ্চ কর্ম' পদ্ধতিকে শুধু ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী প্রসার ও অনুশীলনের পক্ষপাতী ভারত সরকার। এজন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পেতে আবেদন করা হয়েছে।

গতবছরই ভারত সরকারের নিজস্ব সংস্থা 'আয়ুষ' (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy) পঞ্চ কর্ম চিকিৎসা পদ্ধতির নিরাপত্তা ও চিকিৎসা বিষয়ে গাইডলাইন তৈরি করেছিল। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশে চিঠি পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, ওইসব দেশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জনপ্রিয় এবং তারা ভারত থেকে সহযোগিতার প্রত্যাশী।

'আয়ুষ'-এর আয়ুর্বেদ বিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ এস কে শর্মা জানিয়েছেন, "আমরা বিশ্বের ৪৫টি দেশে এ সম্পর্কে চিঠি পাঠিয়েছি। ওইসব দেশে ৩০০০-এর বেশী আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র চলছে এবং জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ছে। 'পঞ্চ কর্ম' চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়তার কথা আমরা জানি। বিশেষ করে ইতালি, সুইজারল্যান্ড, গায়ানাতেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ইল্যাণ্ড-আমেরিকার মতোই জনপ্রিয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্মতি দিতে প্রায় দেড় বছর সময় নেয়। আমরা ইতিমধ্যে এক সপ্তাহ আগে চিঠি দিয়ে 'হু' কে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

আয়ুষ-এর মতে 'পঞ্চ কর্ম' পদ্ধতিতে দেহ নিজেই খাদ্যগ্রহণজনিত বিভিন্ন অসুবিধা দূর করে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। দেশের বাইরে যাঁরা আয়ুর্বেদ পদ্ধতি মতে চিকিৎসা করেন তাঁরা চান পঞ্চ কর্ম আয়ুর্বেদ পদ্ধতির একটি নিয়ামক সংস্থা গড়ে উঠুক। ওই সংস্থাই আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে চিকিৎসারত চিকিৎসকদের স্বীকৃতি দেবে।

ডাঃ শর্মা আরও বলেছেন, এর ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মান উন্নত হবে। এখন তো এমন অনেক চিকিৎসা কেন্দ্র চলছে যা শুধু নামেই পঞ্চ কর্ম আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা। সেখানে প্রকৃত ও মূল পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে।

নিয়ামক সংস্থা চিকিৎসা বিষয়ে গাইডলাইন দেওয়া ছাড়াও চিকিৎসাকেন্দ্রের জন্য লোকবল, প্রয়োজনীয় জমি, আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির পদ্ধতি বিষয়েও পরামর্শ দেবে।

শ্যামাপ্রসাদের জন্যই আজকের পশ্চিমবঙ্গ ঃ জেনারেল চৌধুরী

"শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর্বজনবিদিত, বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্যই আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারছি।" কথাগুলি ভারতের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর। গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১০৮তম জন্মদিন উপলক্ষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতির যৌথ উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক জনসভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী। স্বস্তিকা'র অনেক পাঠক অভিযোগ করেছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকলেও যাঁর জন্য সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। ৬৩তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে 'স্বস্তিকা'র সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে স্বস্তিকা'র প্রতিনিধি এই নিয়ে প্রশ্ন করলে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন তিনি। জানান, তাঁকে সেদিন বলতে বলা হয়েছিল, 'একমাত্র জাতীয়তাবাদেই পশ্চিমবঙ্গের পুনরুত্থান সম্ভব'। তিনি বলেন, "আমি নিজেকে বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলাম। কারণ অন্য বক্তারা সকলেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে বলছিলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।"

এই সময়

কে প্রবীণ!

কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও কর্মনিযুক্তি মন্ত্রকের নীতি অনুযায়ী ৬০ বছরের উর্ধ্বের বয়স্করাই প্রবীণ নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভের অধিকারী। রেলমন্ত্রকও ৬০ বছর ও তদূর্ধ বয়স্ক নাগরিকদের রেলের ভাড়ায় ৩০ শতাংশ ছাড় দিয়ে থাকে। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস ৬৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ও ৬৩ বৎসর বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়ে থাকে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের অবসরের বয়স ৬২। কেন্দ্র সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বয়সসীমা ৬০। কেরলে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৫৫, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে সরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা ৬২।

সর্বংসহা

প্রমাণ হয়ে গেল কেবলমাত্র ধরিত্রীই সর্বংসহা। আর অন্য কেউ নয়। প্রমাণ করল বাণিজ্যনগরী মুম্বাই তীরবর্তী আরব সাগর। এতদিন পর্যন্ত বাণিজ্য নগরীর শিল্পের দাপটে বিভিন্ন শিল্পজাত বর্জ্য যেমন প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ, থার্মোকল ইত্যাদি জমা হচ্ছিল আরব সাগরের গর্ভে। মুম্বাইতে সাম্প্রতিক যে জলচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে, আরব সাগরের কোলে বড় বড় ঢেউ উঠছে; তাতে ফিরে এসেছে একদা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া সেইসব প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ, থার্মোকল প্রভৃতি। এই বায়োডিগ্রেবেল বস্তুসমূহ জমা হচ্ছে আরব সাগরের পাড়ে। বি এম সি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখনও অবধি শিল্পজাত বর্জ্য জমার পরিমাণ ৬.৪ লক্ষ কেজি।

স্বদেশ-বিদেশ

ভদ্রলোকের নাম সঞ্জয় মার্ক ওয়াডবাণী। জন্ম কলকাতায়, সপরিবারে বিলেত যাত্রা ১৯৭৪ সালে। তারপর থেকেই এই স্বদেশী পরিবারটির বাসস্থান একপ্রকার বিদেশেই হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এই ব্যক্তিটি দায়িত্ব পেয়েছেন পূর্ব ভারতের বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনারের। যার কেন্দ্র কলকাতাতেই। ওয়াডবানীজি গত ২৭ জুলাই কলকাতায় সাইমন উইলসনের কাছ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিপর্যস্ত রাজধানী

প্রচন্ড ডামাডোলের মধ্যে পড়েছে রাজধানী নয়াদিল্লী। একদিকে তুমুল বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন , অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে দিল্লী মেট্রোর যে সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে, তার নির্মাণে বেশ বড়সড় ত্রুটি ধরা পড়েছে। দেখা গিয়েছে, সম্প্রসারিত দিল্লী মেট্রো যে স্তম্ভগুলির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে তার মধ্যে আঠারোটিতেই ফাটল। এর উপর তুমুল বর্ষণে নির্মাণকাজ আরও ক্ষতিগ্রস্ত। গত ২৭ জুলাই নয়াদিল্লীতে ৬৯ মি.মি. বৃষ্টি হয়েছে, যা এই বছরে সর্বোচ্চ। বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়েছে হেভিওয়েট রাজনীতিকদের সবসময় আনাগোনা করা দিল্লী বিমানবন্দরও।

খলনায়ক

লোকসভার বিরোধীদলের সহ-নেত্রী সুষমা স্বরাজ বাজেট-বিতর্ক বক্তৃতার সময় অভিযোগ করেন সি পি এম-এর জন্যই দেশে মাওবাদীদের বাড়-বাড়ন্ত। নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে সিপিএম নেতা সীতারামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সীতারাম ইয়েচুরি সেই সমর্থন ব্যক্ত করতে বার বার নেপালে গিয়েছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, প্রথম ইউ পি এ সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে কেন্দ্রকে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নরম ভূমিকা নিতে বাধ্য করেছিল সিপিএম। প্রসঙ্গত খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম প্রকাশ্যে স্বীকার করেন তাঁর সরকার মাওবাদীদের হাল্কাভাবে নিয়েছিল।

উলফার নিশানা

অসমে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী উলফা অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদের দলে টানছে, বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অসম পুলিশের মহানির্দেশক শ্রী শ্রীবাস্তব এই খবর জানিয়েছেন। শ্রীবাস্তব আরও জানিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে উলফা অসমের গুয়াহাটিসহ চারটি বড় শহরে বিস্ফোরণের ছক কষছে। কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে একথা জানা গেছে।

মর্যাদা হারাচ্ছে

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশ্বের সিক্ততম স্থানের মর্যাদা পেত। এবার খরা। গত ৩০ বছরের মধ্যে বৃষ্টিপাতের এত ঘাটতি হয়নি কখনও। ইতিমধ্যে মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও অসমের ১৪টি জেলাকে খরাপীড়িত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি হিসেবে গত ২৩ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টিতে ঘাটতির পরিমাণ — মণিপুরে ৬৭ শতাংশ, মেঘালয়ে ৫৫ শতাংশ, নাগাল্যান্ডে ৬২ শতাংশ, অসমে ৩৪ শতাংশ, মিজোরামে ৩১ শতাংশ, ত্রিপুরায় ৩০ শতাংশ এবং অরুণাচল প্রদেশে ২৯ শতাংশ। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই মৌসুনীরামও সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান থাকবে না।

মহিলা ডি জি পি

বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতাযুক্ত অরুণাচল প্রদেশের প্রথম মহিলা ডি জি পি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বিমলা মেহেরা। তিনি ১৯৮৪ সালে দিল্লীর শিখ বিরোধী দাঙ্গার সময়ে দিল্লী পুলিশের অতিরিক্ত ডি জি পি-র দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সি আর পি, র‍্যাফ এবং দিল্লী পুলিশের অপরাধ নিরোধক শাখার প্রধানের দায়িত্বও পালন করেছেন।

জেহাদ

উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য মণিপুরে সক্রিয় রয়েছে ৩০টি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। একথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই বিধানসভায় জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে মুসলিম জেহাদি গোষ্ঠীটির নাম — পীপুলস্ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট। নাগাল্যাণ্ডে ও বাংলাদেশে এদের মূল ঘাঁটি। সম্প্রতি আগরতলায় স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে এদের ছয় জন জঙ্গি ধরা পড়েছে। প্রত্যেকেই মুসলমান এবং ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ঢুকে মণিপুরে যাওয়ার তালে ছিল।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নাকি রাজনীতি সচেতন। সেই কারণে এই রাজ্যের মানুষ ন্যূনতম ত্রিশ বছরের কমে সরকার পরিবর্তন করেন না। কংগ্রেস দল ১৯৪৭ সালে ক্ষমতায় বসিয়াছিল। সেই কংগ্রেস দলের সরকার পরিবর্তন করিতে এই রাজ্যের রাজনীতি সচেতন মানুষের লাগে ৩০ বছর। ১৯৭৭ সালে আসে সি পি এমের বামফ্রন্ট সরকার। এই সরকার তো ৩২ বছর অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। এখনও বহাল তবিয়তে রহিয়াছে। সাধারণভাবে ২০১১ সাল পর্যন্ত থাকিবেও। তবে কংগ্রেস সরকার বিনাশের দশ বছর পূর্ব হইতেই এমন এমন কাজ করিয়াছিল, যাহা তাহার বিনাশের কারণ হইয়াছিল। শাস্ত্রে বলে, বিনাশকাল উপস্থিত হইলে নাকি মানুষের এমনই হয়। সব সময়ই বুদ্ধি তাকে বিপরীত দিকে লইয়া যায়। এক কথায় বুদ্ধিনাশ হয়।

বামফ্রন্ট সরকারের দাদা সি পি এমের দাদাগিরি যতই বছর গড়াইয়াছে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকার যেহেতু তাহাদের, আইন-আদালতও তাই তাহাদেরই। প্রথম দিনে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জনগণের উপর ভীতির জগদ্দল পাথর হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে, পরে আদালত পথের কাঁটা হইয়া দাঁড়ানোয় পার্টি ক্যাডার নামাইয়া আদালতের বিচারক "অমিতাভ লালা, তুই বাংলা ছেড়ে পালা"-গোছের অপমানজনক মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করিয়াছে অন্যান্য বিচারকদের উপর। বিচারক অমিতাভ লালা সত্যই পালাইয়া বাঁচিয়াছে কিনা জানা নাই, তবে অন্য রাজ্যে বদলি হইয়াছেন ইহা সত্য। ইহা একটি প্রতীকী ঘটনা মাত্র। ইহার দ্বারা কমিউনিস্টরা আদালতের বিচারপতিদের উপর এক মনস্তাত্ত্বিক ভীতি সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, তাপসী মালিক প্রভৃতি মামলায় মনস্তাত্ত্বিক আঁচ আমরা পাইয়াছি।

সারা দুনিয়ার সব দেশের কমিউনিস্টরাই মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদের সর্বহারার 'একনায়কত্ব' তত্ত্বের একনায়কত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালই রপ্ত করিয়াছে। সর্বহারারাই হারাইয়া গিয়াছে। যতই দিন গিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের এই ফ্যাসিবাদী অত্যাচারী একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট হইয়াছে। তাহাদের ঔদ্ধত্য আজ সীমা ছাড়াইয়াছে। যে বয়সে আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত ধীর, স্থির, স্থিতধী ও স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া থাকে, সেই ৭০-৮০ বছর বয়সী কমিউনিস্টরা যে হিংসাত্মক বুলি আওড়ান তাহা হইতে তাহাদের ফ্যাসীবাদী চরিত্রই প্রকাশ পায়। বিনয় কোঙার, সুভাষ চক্রবর্তী, নিরুপম সেন প্রমুখরা তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। ইহাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি তাহাদের নীচের তলার কর্মীদের মধ্যে হিংস্রতা ও ঔদ্ধত্য ক্রমশই বাড়াইয়া দিয়াছে। নানুর, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও ধান্যরুখী গ্রামগুলিতে পরপর সিপিএম'র নীচুতলার হার্মাদ বাহিনীর ফ্যাসিবাদী তান্ডব তাহারই প্রমাণ বহন করিতেছে। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে মঙ্গলকোটের ধান্যরুখী গ্রামে সিপিএম'-গুন্ডাবাহিনীর হাতে নয়জন কংগ্রেস বিধায়কের উপর হামলার ঘটনার ঠিক আগে শিল্প মন্ত্রী নিরুপম সেন সেই গ্রামে তাহার দলের সভায় আঙুল উঁচু করিয়া বলিয়াছিলেন, এই আঙুল একবার হেলাইয়া দিলে এই গ্রামে আর একজনও বিরোধী থাকিতে পারিবে না। মন্ত্রীর এই বক্তব্যে তাহার দলের ফ্যাসী-বাহিনী যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইয়াছিল। কি বুঝিল তাহা কিছুদিন পর কংগ্রেসী বিধায়কগণ বিলক্ষণ বুঝিল।

শাসকগণ যখন জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখন ফ্যাসিবাদী অত্যাচারই তাহার একমাত্র পরিণাম। কেননা বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া সহজ কিন্তু নামা সহজ নয়। ক্ষমতালাভের অপেক্ষা ক্ষমতা হারানোর ভয় বড়ই সাংঘাতিক। কারণ, ক্ষমতা হারাইলে অনেক অপকর্মের প্রমাণ ফাঁস হইবার সম্ভাবনা। আর বৈভবহীন জীবন যাপন করা একজন দোর্দন্ডপ্রতাপ ব্যক্তির পক্ষে অসহ্য। ম্যাকবেথ স্ত্রীর প্ররোচনায় বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়া বসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল একটি হত্যা করিয়া যদি নিশ্চিন্তে রাজত্ব চালানো যায় তাহা হইলে ক্ষতি কী? কিন্তু ম্যাকবেথের জীবন নিশ্চিন্ত হয় নাই। তাহাকে একটি হত্যাকান্ডকে চাপা দিতে একের পর এক হত্যাকান্ড করিতে হইয়াছিল। জীবনের শেষে বেচারা ম্যাকবেথকে খেদের সহিত বলিতে হইয়াছিল যে রক্তের নদী সৃষ্টি করিয়া তিনি এতদূর চলিয়া আসিয়াছেন যে এখন তাহার পক্ষে পিছনে ফিরিতে হইলেও রক্তের নদী বাইয়াই ফিরিতে হইবে।

ইহাকেই বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বা বুদ্ধিনাশ। বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। তাহা না হইলে তো আজও অত্যাচারী ঔরঙ্গজেবের মুঘল শাসন জারি থাকিত। হিটলারের ফ্যাসিবাহিনী কিংবা মুসোলিনীর নাৎসীবাহিনীর শাসন আজও থাকিত। তাহা সম্ভব নয়। কারণ "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" গীতার ভগবান মুখনিঃসৃত বাণীটিই তাহা হইলে মিথ্যা হইয়া যাইবে। সিপিএম দীর্ঘদিন আগেই শিল্প ও শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করিয়া শহরে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। শহরের আসনগুলিতে তাহারা দীর্ঘদিনই পরাজিত হইত। কিন্তু বিনাশকাল উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের সুরক্ষিত গ্রামাঞ্চলও আজ হাত ছাড়া হইয়াছে। শিল্পকে খতম করিয়া তাহারা কৃষিরও টুঁটি টিপিয়া ধরিতেই গ্রামে গ্রামে আজ কৃষকদের প্রতিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আগুনে তাহাদের পুড়িয়া মরিতেই হইবে। তাই তাহাদের বুদ্ধি ও আজ নাশ হইয়াছে। সম্প্রতি সুভাষ চক্রবর্তীর বাহিনী লেকটাউনের সন্নিকটে বরাট নামক জায়গায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি তিনতলা ভবন দখল করিতে উদ্যত হইয়াছে। ১৯৯১ সালে অরুণা বসু মল্লিক নামে এক সংঘপ্রাণা মহিলা এই সম্পত্তি সংঘকে দান করেন। একটি আইনসম্মত সম্পত্তি দখল করাটাও কমিউনিস্টদের কাছে আইনসম্মত। এলাকার মানুষ দলমত নির্বিশেষে এই ফ্যাসিবাদী কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছে। ইহা বিনাশেরই পূর্বাভাস।

বিজেপি কি এখন কংগ্রেসের স্বপ্নপূরণের পথ ধরেছে?

এস গুরুমূর্তি

যখন একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে যায়, তখন কিছু বুদ্ধিজীবী সেই পরিবর্তনে দিশাহারা হয়ে এমন আচরণ শুরু করে যেন তারা এটা হস্তরেখার মতোই পরিষ্কারভাবে আগে থেকেই জানত। তারা এতটাই দিশাহীন হয়ে পড়ে যে তারা ঘটনার ভবিষ্যৎ প্রভাব জানার জন্য যে স্বাভাবিক ধৈর্য প্রয়োজন হয় সেটাও হারিয়ে ফেলে। সম্পূর্ণ জানার আগেই সিদ্ধান্তের থিওরি বানিয়ে ফেলে। তারা এই হঠাৎ পরিবর্তনকে দেখেই চটজলদি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেলে। পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অভাবনীয় জয়লাভ নিয়ে গণমাধ্যমে যে বিতর্ক চলছে সেটাও এই একই রকমের। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। বিজেপি-র পক্ষে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আদর্শ নিয়ে (পড়ুন হিন্দুত্ব নিয়ে) চলা কাজে দেবে কি দেবে না?

ভবিষ্যৎ বিচার করতে গেলে অতীতে ঠিক এই রকম ঘটনা যা ঘটেছিল, তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করাটাও হল একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা ঘটবে যেগুলি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বিজেপি'র উচিৎ সেগুলি থেকে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা। বিজেপি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতোই এই সমস্ত ঘটনাবলীতে প্রতিক্রিয়া জানাবে বা জানাতে বাধ্য হবে।

স্মরণ করুন ১৯৮৯ সাল থেকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়ে গান্ধীজীর সমাজতন্ত্র ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সাল থেকে পরপর ঘটে যাওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালে বিজেপি কংগ্রেসের এই উভয়নীতিই পরিত্যাগ করে। ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র হয়েছিল এক চরম পরাজয়। সে বছর কংগ্রেস পেয়েছিল ৪০৬টি আসন আর বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ২টি। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘটনাবলী যা ঘটেছে তাতে এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস তার ১৯৮৪-এর পাওয়া আসনের অর্ধেকও পায়নি এবং বিজেপি প্রধান বিরোধী দল হিসাবে উঠে এসেছে। ৬ বছরের জন্য কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে দূরেও সরিয়ে রেখেছে নিজে ক্ষমতাসীন দল হিসাবে।

আদর্শ নিয়ে বিতর্ক অত্যন্ত অর্থবোধক হয়ে উঠবে যদি এই বিতর্কের সঙ্গে ১৯৯২ সালে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার তোলা বিতর্কের কথা স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন যে বার্লিন দেওয়াল ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে আদর্শগত ভৌগোলিক-রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে এবং এরপর থেকে বিশ্বে উদার গণতন্ত্র ও মুক্ত বাণিজ্যের মধ্যে কোনও সংঘর্ষ আর থাকবে না। এই দুটিই বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের যুগ্ম লক্ষ্য। দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ফুকুয়ামা, স্যামুয়েল হান্টিংটনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে, যার দৃষ্টিতে সংঘর্ষ ও ইতিহাসের সমাপ্তি নয় বরং উভয়েরই প্রত্যাবর্তন হবে মৌলিক রূপে। অনেক ভূ-রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে পরবর্তী বিশ্ব-ঘটনাবলী ফুকুয়ামার চেয়ে হান্টিংটনের মতামতকেই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছে।

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল আদর্শগতভাবে বার্লিন দেওয়াল পতনের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ভারত পাশ্চাত্যের চেয়ে আধুনিকতায়ও অনেক পিছিয়ে। বার্লিন দেওয়াল পতন পরবর্তী যুগে একটি ভিন্ন আদর্শগত মডেল — ধর্ম ভিত্তিক সভ্য গোষ্ঠী, অনেকের মতে, বিশ্বকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। এমনকী আধুনিক বিশ্বের নব্যতম মুখ বারাক হুসেন ওবামাকেও শতশত বছরের পুরানো আব্রাহমের ধর্মকেই স্মরণ করতে হয়েছে তার চিন্তাধারাকে আজকের রাজনীতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে।

বিজেপি'র আদর্শ তার পূর্বসূরী ভারতীয় জনসংঘের অনুসারী। যে মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পরবর্তীকালে কংগ্রেস সেই মূল্যবোধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে ব্যর্থ হওয়ায় সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই জন্ম হয়েছিল জনসংঘের। রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস আজ সমস্ত কিছুকেই পরিত্যাগ করেছে যা একদিন মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন, মহর্ষি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দে মাতরম্'-এ ভারতমাতার আরাধনা যা হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জাতির স্বাধীনতার জন্য জীবন-যৌবন উৎসর্গ করতে। গান্ধীজীর স্বাধীন ভারতকে রাম-রাজ্যে পরিণত করার ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন কংগ্রেসকে অনুসরণ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দর "আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ", ঋষি অরবিন্দের 'সনাতন ধর্ম' রক্ষার ডাক মানুষের হৃদয়কে সেদিন স্পর্শ করেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিসেবেই। কংগ্রেসের ব্যর্থতাই জনসংঘের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে এবং তাকে জায়গা করে দিয়েছে। জনসংঘ আদর্শগত ভাবে হিন্দু মহাসভা ছিল না যা পরাধীন ভারতে কংগ্রেসের প্রতিবন্ধক ছিল, বস্তুত কংগ্রেস তাদের চিন্তাধারাকে বর্জন করেছে। যদি না কংগ্রেস তার স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলির গূঢ় মূল্যবোধ পরিত্যাগ করত, তাহলে হয়ত জনসংঘের জন্মই হত না এবং বিজেপিও আদৌ আসত না। কারণ দুটো জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পাশাপাশি থাকতে পারে না। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিজেপি'র আদর্শ ছিল ভারতীয়তা, হিন্দুত্ব নয় এবং জনসংঘেরও তাই। ১৯৯০-এর দশকে হিন্দুত্ব রাজনৈতিক হিন্দুত্ব হিসেবে রাজনৈতিক জগতে এক নতুন শক্তিতে উঠে আসে এবং হিন্দুত্বের অ্যালার্জি হিসেবে চিহ্নিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

এই চ্যালেঞ্জই এল কে আদবানীর বিখ্যাত রথযাত্রা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তার নয়া সংজ্ঞা যা মেকী ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে ভিন্ন, বিজেপি'র প্রতি এক মহান অবদান। সুপ্রিম কোর্ট হিন্দুত্বকে ধর্মনিরপেক্ষতার সমার্থক হিসাবে স্বীকৃতির সীলমোহর দিয়ে দেওয়ায়, এটা ভারতীয়তারও ভিন্ন রূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এগুলি সমস্তই কাগজে-কলমের ইস্যু। অন্তর্নিহিত বিষয়ই আসল ইস্যু। উভয়ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। যদি আজকের আমেরিকা নিজেদের আত্মপরিচয়ে গর্ব করতে পারে অতীতের White Anglo Saxon Protestant-দের একটি মিশ্র জতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে, তবে বিজেপি কেন সংস্কৃতির নিরীখে ভারতের আত্ম-পরিচয়ের সংজ্ঞা নিরুপম করতে পারবে না, যখন এদেশের প্রায় সমস্ত মুসলিম ও খৃস্টানরা এই সংস্কৃতি ধারা থেকেই এসেছে?

বিজেপি'র অস্তিত্ব আছে কারণ কংগ্রেস ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির চাপে আজ ভারতের এই আত্মপরিচয় রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপিও যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তার পরিণতি হবে ক্ষয়িষ্ণু বয়োবৃদ্ধ কংগ্রেসেরই মতো। আর যদি আর একটি কংগ্রেসের মতোই পার্টি তৈরি হয়, তাহলে মানুষ আসলটিকেই বেছে নেবে, কার্বন-কপিটিকে নিশ্চয়ই নয়। বিজেপি'র মধ্যে অনেক উচ্চ-চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, যারা ভাল করেই জানেন বিজেপি'র ব্যর্থতার ফল তাঁদের এবং দেশের পক্ষে কি হতে পারে।

ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যের সকলেই তো আর শুধু নিজেদের কথাই ভাবেন না। অনেক, এমন অনেক মানুষ আছেন, বিশেষ করে নেতৃত্বের নীচের দিকে যারা দেশের কথা এবং আরও অনেক কিছু চিন্তা করে থাকেন।

।। লেখক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা এবং স্তম্ভলেখক।।

"১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিজেপি'র আদর্শ ছিল ভারতীয়তা, হিন্দুত্ব নয় এবং জনসংঘেরও তাই। ১৯৯০-এর দশকে হিন্দুত্ব রাজনৈতিক হিন্দুত্ব হিসেবে রাজনৈতিক জগতে এক নতুন শক্তিতে উঠে আসে এবং হিন্দুত্বের অ্যালার্জি হিসেবে চিহ্নিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।"

সংস্কৃত ভারতীর সম্ভাষণ বর্গের সমাপ্তি

সংস্কৃত না জানলে এদেশের সংস্কৃতিকে জানা যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সংস্কৃত না জানলে সংস্কৃতি জানা যাবে না। আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে জানতে হলে সংস্কৃত জানতে হবে। ভারতীয় ভাষাগুলির, বিশেষত বাংলা ভাষার ৮৫ শতাংশ শব্দই সংস্কৃত। গত ২৬ জুলাই কলকাতায় বড়বাজার লাইব্রেরী-তে সংস্কৃত ভারতী আয়োজিত এক সভায় একথা বলেন সংস্কৃত ভারতীর সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কামাত। সংস্কৃত ভারতী গত ১৬ থেকে ২৬ জুলাই কলকাতার দশটি স্থানে দশদিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের আয়োজন করে। দুশোর বেশি শিক্ষার্থী এই সম্ভাষণ বর্গ বা শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

প্রধান অতিথির ভাষণে নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য বলেন, সংস্কারের অর্থ পরিস্কার করা বা মাজা। অন্তর্জগতকে সংস্কৃত করে সংস্কৃত। বিষয়মুখী জীবনকে ভগবৎমুখী করতে চায়। বাল্মিকী রামায়ণের রস আস্বাদন করতে হলে সংস্কৃত জানতে হবে। ইহুদীরা নিজেদের শিকড় সন্ধানের জন্য মাতৃভাষা হিব্রুকেই আশ্রয় করেছে। চাই নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি স্বাভিমানবোধ।

সভাপতি বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী বলেন, সংস্কৃত মানুষের দৈবী বা শুভবোধকে বিকশিত করে। সংস্কৃত ভাষা যে কথ্য ও সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা ছিল, আদি শংকরাচার্য ও শ্রীচৈতন্যের ভারতব্যাপী পরিব্রাজক জীবনই তার প্রমাণ। আমাদের পূজার মন্ত্র, জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম্-এর ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃতকে অস্বীকার করার অর্থ জাতি সত্ত্বাকেই অস্বীকার করা।

অনুষ্ঠানের মাঝে সংস্কৃত গীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেষণ করে আদ্যাপীঠ মণিকুন্তলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন প্রণব নন্দ, প্রণব বর, কাশীনাথ নন্দী, মলয় দেবনাথ ও মৌমিতা বসু।

সম্ভাষণ বর্গে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণরত নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য। মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) দীনেশ কামাত ও বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।

হিন্দুদের ওপর হামলার ছক স্পষ্ট

(১ পাতার পর)

প্রথম পদক্ষেপ হবে ভারতের মাটিতেই মুসলিম প্রধান এলাকা গড়ে তোলা। এই কাজটি সফলভাবে করতে পারলে ভারতীয় মুসলিমদের প্রভাব প্রতিপত্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর এই কাজে কংগ্রেস নেতারা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।" সুরাওয়ার্দির এই ঐতিহাসিক চিঠিটির তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল।

দেশভাগের অনেক আগেই মুসলিমদের স্বাধীন হোমল্যান্ডের প্রবক্তারা জানতো যে একটি বা দুটি পাকিস্তান গড়লেই ভারতের সব মুসলমানদের সেখানে বসবাসের স্থান হবে না। তারা চেয়েছিল ভারতের বুকে অসংখ্য ছোট ছোট মুসলিম হোমল্যাণ্ড গড়তে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক চৌধুরী রহমত আলি ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে একটি প্রবন্ধে প্রস্তাব দেন যে বাংলা ও অসমকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গড়তে হবে। এই প্রস্তাবেরই প্রতিধবনি শোনা যায় ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ আব্দুল রশিদের কণ্ঠে। ১৯৩৮ সালে তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে দাবী জানান যে ব্রহ্মদেশের মতোই পাঞ্জাব-যুক্তপ্রদেশ-দিল্লী-বাংলা-অসমকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুঘল-ই-স্তান গড়তে হবে। দিল্লী হবে প্রস্তাবিত মুঘল-ই-স্তানের রাজধানী। কারণ, ভারতের মুসলমানরা কিছুতেই হিন্দু শাসনে বসবাস করবে না। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় আর কোপল্যাণ্ডের লেখা, "ট্রুস্ঃব্দব্ধনব্ধত্তব্ধনস্প্রপ্ত ত্নজস্সস্তুন্দপ্প স্পন্দ্র ঢস্তুন্ত্র" বইটিতে। ১৯৪৪ সালে লন্ডন থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রণববাবুরা ভোটের লোভে মুসলিম তোষণ নীতি জোরদার করেছেন। কিন্তু এর বিষময় ফল হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ। যে বিভেদ একদা দেশভাগ করেছে। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মুসলিমদের জন্য ৮৩,০০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করেছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের খাতায় এই ঋণ গ্রহীতাদের সম্পর্কে লেখা হয় — এরা 'ক্রেডিট রিস্ক গ্রুপ' অর্থাৎ ঋণের অর্থ ফেরৎ নাও পাওয়া যেতে পারে।

গো-রক্ষা হলেই

(১ পাতার পর)

ব্যাপী বিশ্বকল্যাণ গো-গ্রাম যাত্রা সারা দেশজুড়ে হতে চলেছে। আগামী বিজয়া দশমীর দিন এই যাত্রা হরিয়ানা প্রদেশের কুরুক্ষেত্রে শুরু হবে। আর মকর সংক্রান্তির দিন নাগপুরে যাত্রা সমাপ্ত হবে। সারা দেশের প্রমুখ সাধু-সন্তদের মার্গদর্শক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। ভারতের চারজন জগৎগুরু শংকরাচার্যই এই যাত্রা বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত ও সহযোগিতা প্রদান এবং সাফল্য কামনা করেছেন। যোগগুরু রামদেবজী যাত্রার শুরুতে এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তো থাকবেনই, সেই সঙ্গে আরও অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। যাত্রা ১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করবে। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকে। কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাহুল সিন্‌হা প্রান্ত সমিতির (দঃ বঃ) সভাপতি হয়েছেন বলে জানা গেছে।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্য নেতৃত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রীর বিদায় আসন্ন

নিশাকর সোম

১৯৯৩, ২১ জুলাই। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় এদিন আন্দোলনরত কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। যে জ্যোতি বসুকে জন্মদিনে এবং হাসপাতালে গিয়ে বা তার আগে মহাকরণে গিয়ে প্রণাম করে মমতা ব্যানার্জি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। কারণ ২৩ বছরের জ্যোতি বসুর শাসন বুদ্ধ বাবুর ৯ বছরের শাসন থেকে ভাল এটা প্রমাণ করার জন্যই জ্যোতিবাবুকে তুলে ধরা হচ্ছে। তৃণমূলের অঘোষিত মুখপত্র — যার মালিক তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য, সেই পত্রিকাতেও জ্যোতি বন্দনা করে ব্যবসায়িক স্বার্থে ক্রোড়পত্র বেরায়। এর নামই কি দ্বিচারিতা?

যা হোক, ১৯৯৩ সালের এই ঘটনার পর তদানীন্তন যুব-কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ওই দিনটিকে "শহিদ' দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বলেছিলেন যে সিপিএম সরকারের রাজনৈতিক হিংসার শিকার। এর আগের বছরগুলিতে এই দিনে মমতা ব্যানার্জির বক্তব্য থাকতো সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও রাজনৈতিক প্রচার।

কিন্তু এবারের ২১ জুলাই-এর শহিদ দিবস সংখ্যার দিক থেকে এবং গুণগতভাবে এক নবরূপ ধারণ করেছিল। এই সভায় এস-ইউ সি তৃণমূল একাত্ম হয়ে যায়।

এবারের সভায় বিশাল সমাবেশ ঘটেছিল। মমতা ব্যানার্জীর কথায় ৩০ লক্ষের সমাবেশে। পুলিশের মতে ৬-৭ লক্ষ। সে যা হোক, এক বিশাল সমাবেশ। এই সমাবেশটি এবার বস্তুত তৃণমূল-কংগ্রেসের বিজয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই জনসমাবেশে শহিদদের উদ্দেশে কোনও স্মৃতিচারণ ছিল না। ছিল এক আনন্দ-উৎসবের উচ্ছ্বাস। সভায় রিজওয়ানের মা, বৌদি ও দাদা উপস্থিত ছিলেন। ওই ১৩ জন শহিদের পরিবারের কতজন উপস্থিত ছিলেন তাঁর কোনও উল্লেখ হয়নি। অথচ ওই শহীদদের স্মৃতিকে বহন করেই মমতা মন্ত্রী-মমতা হয়ে উঠেছেন। এর জন্য জ্যোতি বসুকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেওয়া যায় না কি? সদ্য সমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনেও এই রিজওয়ান -এর পরিবারকে নিয়ে মুসলিম এলাকাতে জনসভা হয়েছিল। এদিনের এই সমাবেশে মঞ্চে টিপু সুলতান মসজিদের শাহি ইমাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও বারবার দেখা গিয়েছিল। উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, ফুরফুরার পীর সাহেবকেও নির্বাচনে প্রচারে লাগানো হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, পীর সাহেবকে রেলের একটি কমিটিতে নাকি স্থান দেওয়া হবে।

এবারের সভায় মমতা ব্যানার্জির দলীয় কর্মীদের আচরণ নিয়ে কিছু কথা ছিল। যেমন, বিনয়ী হতে হবে, অবরোধ, বন্ধ করা চলবে না — সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা চলবে না। এ কথার অর্থ কি এসব কান্ড আগে করা হতো? যা হোক, এই সভায় মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছেন যে "দিদির হাতে বায়োডাটা দিয়ে চাকরি চাইলে হবে না। কারণ একটা দপ্তরে কত চাকরি দেওয়া যাবে? এর জন্যই আগামী ২০১১ সালে বিধানসভা অধিকার করে মন্ত্রিত্বে যেতে হবে, তখন লক্ষ লোকের চাকরি হবে।"

এই সভা মহাশ্বেতা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। মহাশ্বেতা দেবী বলেন, "মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে।"

এসব লেখার অর্থ এই নয় যে, সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের সাফল্যকে ছোট করছি। বলতে চাই ব্যাপকভাবে যুব সম্প্রদায় চাকরির জন্য ব্যাকুল। তাদেরকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হল।

এই ধরনের প্রতিশ্রুতি আশ্বাসের ধাপ্পাবাজির ফল হল আজ সিপিএম-এর করুণ পরিণতি। এই সভায় মমতা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দলতন্ত্র করবে না। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ রেলের দু'টি কমিটিতে মমতার থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর (মমতাই বলেছিলেন) সুশীল সমাজের প্রায় সকলেই স্থান পেয়েছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান শুভাপ্রসন্ন, অপরটির ব্রায়ান ও ডেরিক। এই সভায় মমতা ব্যানার্জি সোমেন মিত্র-কে তৃণমূল নেতা হিসাবে ঘোষণা করেন!

আগামী শাসক দলের বুলন্দ আওয়াজ-

ঘটনা হল, ইতিমধ্যেই বুদ্ধ-বিমান পার্টির মধ্যে এবং বামফ্রন্টের সামনে এক কাটা-সৈনিকের ভূমিকায় এসে পৌঁছেছেন। মহাকরণে যে সব সাংবাদিক যান তাঁরা দেখেছেন, দিনে দিনে মুখ্যন্ত্রীকে সবাই অস্পৃশ্য অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে দেখছেন। তাঁরা বলাবলি করে থাকেন, 'বুদ্ধবাবু ক্ষমতালোভী, তাই এখনও ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছেন।

এর পাশাপাশি বিদায়ী শাসক দল লক্ষ্মৌ-এর ভুলভুলাইতে ঢুকেছে। সিপিএম-এর বিরুদ্ধে চক্রব্যূহ তৈরি হয়েছে।

সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের পরাজয় সম্পর্কে যা লিখেছে তা এই কলামে একাধিক লেখাতেই বলা হয়েছিল। নিচের তলার কর্মীদের অধঃপতন থেকে নেতৃত্বের চূড়ান্ত নোংরা ভাষা, উদ্ধত মনোভাব সবই আমাদের লেখায় প্রকশিত হয়েছে। এই সব বিষয় নিয়ে ১ ও ২ আগস্ট সি পি এমের রাজ্য কমিটির সভায় পর্যালোচনা হওয়ার কথা। এই সভায় রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আবার বিস্ফোরণ ঘটবে। প্রায় সকলেই বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয়-শ্যামলের পরোক্ষে পদত্যাগ চাইবেন বলে জানা গেছে। রেজ্জাক মোল্লা, তড়িৎ তোপদার, অমিতাভ নন্দী, অমিয় পাত্র, দীপক সরকার এমনকী কান্তি গাঙ্গুলীও সরব হবেন।

ঘটনা হল, ইতিমধ্যেই বুদ্ধ -বিমান পার্টির মধ্যে এবং বামফ্রন্টের সামনে এক কাটা-সৈনিকের ভূমিকায় এসে পৌঁছেছেন। মহাকরণে যে সব সাংবাদিক যান তাঁরা দেখেছেন, দিনে দিনে মুখ্যন্ত্রীকে সবাই অস্পৃশ্য অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে দেখছেন। তাঁরা বলাবলি করে থাকেন, 'বুদ্ধ বাবু ক্ষমতালোভী, তাই এখনও ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছেন। সামান্য আত্মসম্মান বা মর্যাদা বোধ থাকলে ১৬ তারিখ নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পরদিনই পদত্যাগ করতেন।

এখন বুদ্ধ বাবুর পাশে নিরুপম, সুশান্ত ঘোষ, মদন ঘোষ, তথা বর্ধমান লবি নেই। সেই সভায় নির্বাচনে বিপর্যয়ের প্রধান দায়িত্ব রাজ্য নেতৃত্বের, সেটাই প্রতিষ্ঠিত হবে। যদিও ওই সভায় সাংগঠনিক আলোচনা হবে না, তবুও মন্ত্রিসভা, পার্টি নেতৃত্ব পরিবর্তনের আওয়াজ উঠবে। এটা আজকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার—সি পি এমের নাভিশ্বাস উঠছে। একথা এই কলামে আগেই লেখা হয়েছিল।

এদিকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে নিরুপম-মদন ঘোষরা আলোচনা চালাচ্ছেন। যাতে মন্ত্রিত্বে ও পার্টি নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা যায়। তাঁরা এই মুহূর্তে বুদ্ধ-বিমানকে টার্গেট করেছেন। তাঁদের কৌশল হবে মন্ত্রিত্ব থেকে নিরুপম সেনকেও সরিয়ে দিয়ে পার্টির রাজ্য সম্পাদক পদে বসানো। সম্পাদকমণ্ডলীতে রেজ্জাক মোল্লা, দীপক সরকার, অমিয় পাত্র, রবীন দেবকে আনা। এক বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গৌতম দেব, যদি তিনি

(এরপর ৬ পাতায়)

অন্য রকম

পবিত্র রন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মাত্র একটা উৎসবই বদলে দেয় গোটা রাজ্যের চিত্রটা। দশটা দিন বোঝার উপায়ই থাকে না এটা কেরল, নাকি অন্য কিছু। সারি সারি রান্নার উনান আর রাঁধুনীর ভিড়। সমগ্র তিরুবনন্তপুরমটাই যেন এক বৃহৎ রন্ধনশালার রূপ নেয়। প্রতিবছরই পালিত হয় এই উৎসব। এমন গণরন্ধন উৎসবের কোনও আভিধানিক নাম নেই, বাংলায় 'রান্না' নিয়ে কয়েকটি উৎসব প্রচলিত থাকলেও, এই উৎসব অবশ্য তা থেকে পুরোপুরি আলাদা।

এই উৎসবের সবটাই মহিলাদেরকে কেন্দ্র করে। কোনও পুরুষই এতে 'নাক গলাতে' পারেন না।

কেরলের তিরুবনন্তপুরমের আট্টুকাল ভগবতী দেবীর মন্দির চত্বরে বসে এই 'রান্নার মেলা'। সারি সারি বসানো হয় রান্নার উনান। উনান বলতেও শুধু ইঁট দিয়ে সাময়িক একটা ব্যবস্থা। এই উৎসবের মূল অঙ্গই হল রান্না-বান্না। সুস্বাদু পায়েস তৈরি আর তা বিতরণ। এতেই মেলে উৎসবের সার্থকতা। সেই সঙ্গে রাঁধুনীদেরও। রাজ্যের সব প্রান্ত থেকেই কাতারে কাতারে মহিলারা হাজির হয়। অনেকে রান্নার ভালো জায়গা পেতে একদিন আগে এসে সব ব্যবস্থা পাকা করেন।

নতুন মাটির হাঁড়িতে চাপাতে হয় পায়েস। তারপর তা ঢালা হয় স্টেনলেস স্টীলের হাঁড়িতে। পরে তা প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয়। হাই স্ট্যাটাস থেকে বস্তির ঘর — সব ঘরের মহিলারাই এতে অংশ নেয়। ইঁটের তৈরি উনানে খড়-কুটো দিয়ে রান্নার অভ্যাস না থাকলেও, দশদিন ধরে চলা এই উৎসবে তাও শেখা হয়ে যায়।

কেরলে তিরুবনন্তপুরে ভগবতী মন্দিরে 'রান্নার মেলা'।

গন্ডগ্রামের কোনও এক গাঁয়ের বধূর মতোই উনানে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাতে হয়। একটা একটা করে কাঠি দিয়ে রাঁধতে হয় পায়েস।

কেরলের মহিলদের এই উৎসব খুবই জনপ্রিয়। ভিড়ও কম হয় না দশটা দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পালা দিয়ে চলে রান্না। প্রতি বছরই লাখের ঘরে মহিলা উপস্থিত হয়। সব পরিবার থেকেই ভক্তদের ভিড় জমে। দু'বছর আগে ক্রিকেটার এস শ্রীশান্থের মা'ও এতে অংশ নিয়েছিলেন। উৎসবের ব্যাপকতা 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড'-এও জায়গা করে নিয়েছে। দশটা দিন উপস্থিত মায়েরাও বুঝতে পারেন, তাঁর পরিবারটা ছোটো নয়। বেশ বড়!

হিন্দুদের প্রতিরোধের জের

দীপালির খুনীদের ফাঁসির হুকুম

সংবাদদাতা, মালদা ।। আর এস এস, বিদ্যার্থী পরিষদ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বিজেপি-র সম্মিলিত প্রতিবাদ এবং হিন্দু শক্তির প্রবল আন্দোলনের ফলে গত তিন বছর আগে মালদা জেলার বকচর গ্রামে পঞ্চ ম শ্রেণীর ছাত্রীকে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে যে দু'জন মুসলিম দুষ্কৃতী ধরা পড়েছিল গত ২১ জুলাই তাঁদের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে মালদা জেলা আদালত। গত ২০০৬ সালের ২৮ জুলাই ১২ বছরের ছাত্রী দীপালি রায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়। পরের দিন একটি পাটক্ষেতের মাটির নীচ থেকে মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরিবারের অভিযোগ সত্ত্বেও পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার না করলে সেই সময় সঙ্ঘ এবং সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলি থানা ঘেরাও এবং প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। সিপিএম এবং কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগ করে এবং মারামারি হয়। শেষে পুলিশ তদন্ত করে এবং জাহাঙ্গির আলম (৩০) নামে স্থানীয় যুবকের বাড়ি থেকে মাটি মাখা লুঙ্গি, কোদাল এবং রক্তমাখা বাঁশ উদ্ধার করে। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আনারুল হক (২৬) এবং মিঠুন ওরফে রেজয়ানুল হক (১৭)-কে গ্রেপ্তার করে। তাদের বাড়ি থেকেও মাটি মাখা লুঙ্গি উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশি জেরায় ধৃতরা স্বীকার করে ধর্ষণের পর মেয়েটিকে খুন করেছিল। মালদা জেলার বামনগোলা থানার বকচর গ্রামের এই ঘটনায় বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ফলে সঙ্ঘের মালদা বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ নির্মল নাথকে মিথ্যা মামলায় এক সপ্তাহ জেলেও থাকতে হয়েছিল। আজ ২১ জুলাই মঙ্গলবার মালদা জেলা ফাস্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক পুলক কুমার কুণ্ডু জাহাঙ্গির আলম ও আনারুল হকের ফাঁসির রায় ঘোষণা করলে আদালতে উপস্থিত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর এক আসামী রেজয়ানুল হক (১৭) নাবালক হওয়ায় জুভেনাইল কোর্টে বিচার চলছে। প্রায় তিন বছর মামলা চলার পর এবং ২৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দানের পর এদিন আদালত অপরাধী দুই যুবকের ফাঁসির নির্দেশ দেয়।

মালদা

মৃত দীপালির পিতা কৃষ্ণপদ রায় বলেন, দোষীদের শাস্তি হওয়ায় আমরা খুশি। এতদিন পর আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে। তবে আর একজন আসামী নাবালক বলে যাতে ছাড়া না পায় এবং উপযুক্ত শাস্তি হয় তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সরকার পক্ষের আইনজীবী ফণীভূষণ সরকার বলেন, নাবালক আসামী সাময়িক খালাস পেলেও জুভেনাইল কোর্টে মামলা চলছে। নিশ্চয় অপরাধীর শাস্তি হবে।

শিশুশ্রম রুখতে টাস্কফোর্স ঠাণ্ডা ঘরে

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলায় শিশুশ্রম রুখতে টাস্ক ফোর্স গঠন হলেও তা ঠাণ্ডা ঘরে চলে গিয়েছে। প্রকাশ যে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘটা করে রাজ্যের মধ্যে প্রথম এই জেলাতে শিশুশ্রম রুখতে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। জেলার শ্রম দপ্তর ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত টাস্ক ফোর্স জেলাতে একটিও অভিযান চালায়নি। ফলে জেলা জুড়ে হু হু করে বাড়ছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ইসলামপুরে শিশু শ্রমিকদের জন্য রাজ্যের একমাত্র আবাসিক স্কুলটির কার্যকারিতা নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার প্রোজেক্টের (এন সি এল পি) কর্মীরাও এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে প্রকাশ। এ ব্যাপারে অবশ্য জেলা শ্রম দপ্তর সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। আরও জানা গেছে যে, টাস্ক ফোর্সের প্রথম এবং একমাত্র বৈঠকে জেলার শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের মাস্টার প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন যে, সমগ্র জেলা জুড়ে এই নিয়ে অভিযান হবে। আর যারা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর দিনাজপুর

এদিকে এন সি এল পি সূত্রে জানা গেছে যে, বর্তমানে এই জেলায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে প্রায় ২২ হাজার শিশু শ্রমিক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে।

যদিও শিশুশ্রম রোধে জেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে এন সি এল পি'র জেলা ডিরেক্টর দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন যে টাস্ক ফোর্স কাজ না করলে আমরা নিরুপায়।

জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করেছে যে, সরকারি হিসাবে (এন সি এল পি) জেলায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ হাজার বলা হলেও বেসরকারি সূত্রে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে।

অসমের রাজনীতি

অনুপ্রবেশকারীরাই নির্ণায়ক শক্তি

বাসুদেব পাল ।। অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে নিকট ভবিষ্যতে অসমের নিয়ন্ত্রণ আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশী মুসলিমদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কা থেকেই গত বছর অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাদের রাজ্য থেকে বাংলাদেশীদের বহিষ্কার করতে শুরু করে। তখন অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা আপন প্রাণ বাঁচাতে অসমে ঢোকা আরম্ভ করে। অসমের মাদ্রাসা-ছাত্ররা অসমীয়াদের অরুণাচল থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে বলে কয়েকটি জেলায় বন্‌ধের ডাক দেয়। ১৪ আগস্ট, ২০০৮-এ অসমের উদালগুড়ি ও দরং জেলা বনধ্‌ ডাকে বিভিন্ন মুসলিম ছাত্র সংগঠন। ফলে বোড়ো জনজাতি ও মুসলমানদের মধ্যে সামনা-সামনি সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরের মাসেই দরং উদালগুড়ি এবং শোণিতপুর জেলাতে বোড়ো অধ্যুষিত গ্রামে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে আক্রমণ শুরু করে। বোড়োদের সহস্রাধিক ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। ব্যাপক সংখ্যায় বোড়ো জনজাতির লোকেরা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। অনেক হতাহত হয়। খবর বের হয় যে, অনেক মুসলিম আক্রমণকারীরা নওগাঁ থেকেও যোগ দিয়েছিল। বোড়োদের এভাবে আক্রমণের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বোড়োদের পরিত্যক্ত জায়গায় অরুণাচল থেকে বিতাড়িত (পড়ুন বাংলাদেশ থেকে আগত) মুসলমানদের পুনর্বাসন দেওয়া। এই হামলা নিয়ে ২০০৯-এর জানুয়ারিতে অসম বিধানসভায় তুমুল বাক্‌-বিতন্ডা হয়। তারপর রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার দরং-উদালগুড়ির দাঙ্গার সি বি আই তদন্তে সম্মতি দেয়। সম্প্রতি সি বি আই নিজেই তদন্তে অসম্মতি ব্যক্ত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কার চাপে পড়ে সি বি আই-এর এই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া। এর পেছনে অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতাদেরই যে হাত রয়েছে তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

বাংলাদেশীরা যে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক — এটা কোনও নতুন কথা নয়। অসমের রাজনীতিতে নবগঠিত এ ইউ ডি এফ সেই ভোটব্যাঙ্কে ভালোমতো কামড় দিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে, অসমে বিধানসভা ক্ষেত্রের হিসেবে এ ইউ ডি এফ রাজ্যের মোট ১২৬টি বিধানসভার মধ্যে ২৫টি ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে ৩৪টি বিধানসভায় এ ইউ ডি এফ-ই নির্বাচনী ফলাফলের নির্দ্ধারণের নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। অপরপক্ষে মোট ১৪টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে আটটিতে (শিলচর, করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, কোকরাঝাড়, বরপেটা, মঙ্গলদৈ, নগাঁও এবং কালিয়াবর) মুসলমান ভোটারদের হাতেই জয়-পরাজয়ের চাবিকাঠি। এর মধ্যে করিমগঞ্জ আসনটি অনুসূচিত জাতি এবং কোকরাঝাড় অনুসূচিত জনজাতিদের জন্য

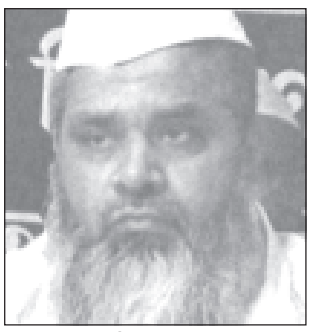

বদরুদ্দিন আজমল

সংরক্ষিত। এ ইউ ডি এফ ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম আবির্ভাবে মোট ৬৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে দশটিতে জয় এবং অন্য ১১টি বিধানসভায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ৯.০৩ শতাংশ। ২০০৬ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে এ ইউ ডি এফ এর অগ্রগতি লক্ষ্য করার মতো। এই অভ্যুত্থানকে অবহেলা করাটা ঠিক হবে না।

এবার ২০০৬-এর বিধানসভা এবং ২০০৯-এর লোকসভা দুটো নির্বাচনের মিলিত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে আরও স্পষ্টভাবে এ ইউ ডি এফ-কে দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে, অসমের মোট ২৩টি জেলার মধ্যে নয়টি জেলার ৫৫টি বিধানসভার মধ্যে ২৮টি বিধানসভায় এ ইউ ডি এফ প্রথম স্থানে এবং ৭টিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এ ইউ ডি এফ-এর নীতি এবং প্রতিচ্ছবি মুসলিম লীগের মতোই। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে অসমের ছটি জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, হিন্দুরা সংখ্যালঘু। ২০১১-তে আরও কয়েকটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার মধ্যে মরিগাঁও একরকম নিশ্চিত। এসময় অসমে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হল — করিমগঞ্জ ৫২.৩০ শতাংশ, হাইলাকান্দি ৫৭.৬২ শতাংশ, ধুবড়ি -৭৪.২৯ শতাংশ, গোয়ালপাড়া ৫৭.৭১ শতংশ, বরপেটা ৫৯.৩৬ শতাংশ এবং নওগাঁ জেলাতে মুসলিম জনসংখ্যা ৫০.৯৯ শতাংশ। এই জেলাগুলোতে বিধানসভার আসনসংখ্যা ৩৮টি। বিগত লোকসভার নির্বাচনে এ ইউ ডি এফ কুড়িটি আসনে প্রথম এবং ৬টি বিধানসভায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

এদিকে কাছাড় জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৩৬.১৩ শতাংশ, বনগাঁইগাঁও-এ ৩৮.৫২ শতাংশ এবং দরং-এ ৩৫.৫৪ শতাংশ। এই তিনটি জেলায় বিধানসভার আসন সংখ্যা ১৮টি। তার মধ্যেও এ ইউ ডি এফ পাঁচটিতে প্রথম স্থানে।

দরং ও উদালগুড়ির দাঙ্গায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংলিপ্ত থাকা যদি সি বি আই তদন্তে ধরা পড়ে যায় তাহলে শাসক দলের অসুবিধা হওয়াটা স্বাভাবিক, এছাড়া দাঙ্গা দমনে কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের অসাফল্যও ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। কেন্দ্র বা রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের বোঝা উচিৎ — মুসলিম তোষণের রজনীতি দেশভাগ রুখতে পারেনি, এখন অসমকেও রক্ষা করতে পারবে না। ১৯৯৬ থেকে ২০০৯-এর নির্বাচনের মধ্যে সারা দেশে ভোটার বৃদ্ধির হার ২০.৪৫ শতাংশ অথচ ওই একই সময়সীমায় অসমে ভোটার বৃদ্ধির হার ৩৮.৫৬ শতাংশ। মোট ভোটার ১২৫৮৯০৬৭ থেকে ১৭৪৪৩৬১৭ জন হয়েছে। ২০০৪ এ অসমে ভোটার সংখ্যা ছিল — ১৫০১৪৮৭৪ যা ২০০৬-এ বেড়ে ১৭৪৩৪০১৯ হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র দু'বছরে ভোটার বেড়েছে ২৪১৯১৪৫ জন। আর সংযোগবশত ২০০৬ সালেই অসমের রাজনীতিতে এ ইউ ডি এফ-এর উত্থান। হিন্দু ভোট ভাগ হওয়া আর মুসলমান ভোটারদের একজোট হওয়ার ফলে এ ইউ ডি এফ অসমে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এ ইউ ডি এফ অসমে ক্ষমতার নির্ণায়ক ভূমিকায় এলে অনুপ্রবেশ বিরোধীদের উপর চাপ বাড়বে। আর এর ফলে অসম কার্যত ভারতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদায় আসন্ন

(৫ পাতার পর)

অসুস্থ হন তবে ডঃ অসীম দাশগুপ্তকে করার কথা ভাবা হচ্ছে।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও উত্তর ২৪ পরগণাতে পার্টি নেতৃত্বের বদল করার কথাও উঠেছে। প্রসঙ্গত পরিবহন মালিকদের ধর্মঘটে অনড় থাকা এবং সুভাষবাবুর ডাকা সভা ভেস্তে যাওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া হল— সুভাষবাবু অতীতে পরিবহন মালিকদের আস্কারা দেওয়ার ফলে আজ এই অবস্থা। মালিকরা বলার আগেই বাস-ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে বামফ্রন্টের নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, বামফ্রন্টকে না জানিয়ে কাজ করার পূর্ব প্রবণতা এখনও অবসান হয়নি।

অবশ্যই বামফ্রন্ট ভাঙার পথে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ এবং আর এস পি নেতা মনোজ ভট্টাচার্যর সঙ্গে ছত্রধর মাহাতোর আলোচনা হয়েছে। এই দুই নেতাই জনগণের কমিটির প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। সি পি এম জোর করে বিমান বসুকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসাবে বসিয়ে রেখেছে— এটাই বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির বক্তব্য। কারণ বর্তমানে প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জীর মর্যাদা বিমান বসুর প্রাপ্য নয় এবং এটা আশা করাটাও ভুল— একথা জনৈক সি পি আই নেতার মত। তাঁর মতে, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান পদ তুলে দিয়ে একজন কনভেনর করা হোক, সেটা কিরণময় নন্দ অথবা প্রতীম চ্যাটার্জীকে করা হোক।

বিধানসভার খালি হওয়া কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেস শিয়ালদহ, বৌবাজার এবং মালদহের কেন্দ্র চাইছে। তৃণমূল শিয়ালদহ, বৌবাজার ছাড়তে রাজি নয়। শিয়ালদহে প্রার্থী হবার জন্য তাপস রায় স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠন থেকে কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ঘোষকে হটিয়ে দিয়েছেন। প্রদীপবাবু প্রার্থী হতে না পারলে তিনি প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেসের বাদল ভট্টাচার্যকে প্রার্থী দিতে বলবেন।

কলকাতা জেলা সি পি এম আগামী বছরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর নির্বাচন নিয়ে চিন্তিত। মেয়র হিসাবে মুসলিম প্রার্থীর কথা ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। এর কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের এক মুসলিম নেতাকেই (যিনি বর্তমানে পৌর প্রতিনিধি) মেয়র হিসাবে প্রজেক্ট করতে চাইবে। সেই নেতাই একথা বলে বেড়াচ্ছেন। রাজীব দেব কি বলেন?

তদন্তের অন্তর্বর্তী রিপোর্টে প্রকাশ

কন্ধমাল দাঙ্গার মূলে ধর্মান্তরকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ওড়িশার কন্ধমাল জেলায় গত দু'বছর ধরে চলতে থাকা হিংসা এবং সঙ্ঘর্ষের পিছনে মূল কারণই হল ধর্মান্তরকরণ। কন্ধমাল দাঙ্গার তদন্তের অন্তর্বর্তী রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। গতবছর কন্ধমালে স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী সরস্বতী ও তাঁর চার অনুগামীর নিষ্ঠুর হত্যালীলার পর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার তদন্তের জন্য ওড়িশা সরকার বিচারপতি শরৎচন্দ্র মহাপাত্র-এর নেতৃত্বে এক সদস্যের কমিশন গঠন করে। কমিশন সম্প্রতি এক অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিস্তৃত তদন্ত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিচারপতি মহাপাত্র এই রিপোর্টে তা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মান্তরকরণ, জমি নিয়ে বিবাদ এবং জাতিগত জাল প্রমাণপত্রই হিংসাত্মক ঘটনার মূলে। এখানে উল্লেখ্য যে, ওই জাতি গোষ্ঠীগত দাঙ্গায় কন্ধমাল জেলায় ৪৩ জন নিহত, হাজার হাজার ঘর-বাড়ি, মন্দির ও চার্চ সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

জনজাতি অধ্যুষিত কন্ধমাল জেলায় ধর্মজাগরণের শঙ্খনাদ করে জনজাতিদের খৃস্ট মতে মতান্তরিত করার পথে বিশাল বাধার প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী। তাঁকে হত্যা করার ফলে প্রতিক্রিয়া হিসেবে কন্ধমাল জেলাতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তা এতটাই বড় আকার ধারণ করে যে, দেশ-বিদেশেও তা খবরের শিরোনামে চলে আসে। তখন বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, এটা সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ নয়। চার্চ কর্তৃক প্ররোচিত ও সঞ্চালিত জাতি-গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ। যার মূলে রয়েছে মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া। ঘটনা হল এই কথাই বিচারপতি মহাপাত্রের অন্তর্বর্তী রিপোর্টেও বলা হয়েছে। যদিও তিনি ধর্মান্তরকরণের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেননি। কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছেন, কন্ধমাল জেলার বনবাসী, অনুসূচিত-জাতি-জনজাতিদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ, পারস্পরিক সন্দেহই এই দাঙ্গার মূল কারণ। 'কন্ধ' জনজাতির লোকেদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে,

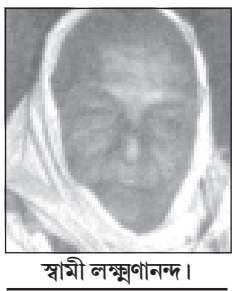

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ।

'পাণ' জনজাতির লোকেরা জাল নথিপত্র তৈরি করিয়ে তাদের জমি-জায়গা দখল করছে। ব্যাপক সংখ্যায় জনজাতিদের ধর্মান্তরকরণ-এর সঙ্গে জাল জাতিগত প্রমাণপত্র-এর কারণে 'কন্ধ' জনজাতিদের মনে যুগপৎ সন্দেহ এবং ভয় বাসা বেঁধেছিল। কন্ধমাল জেলাতে কন্ধ জনজাতিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ। গত ১ জুলাই বিচারপতি মহাপাত্র তাঁর প্রদত্ত অন্তর্বর্তী রিপোর্টে 'কন্ধ' ও 'পাণ' জনজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তাহীনতা, ভয় ও সন্দেহ দূর করার প্রচেষ্টা করতে প্রস্তাব দিয়েছেন। বলেছেন, সরকারকে অনতিবিলম্বে এই জনজাতিদের মধ্যে মতভেদ দূর করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আরও বলেনে, তদন্ত পুরো হতে কমপক্ষে দু'বছর সময় লাগতে পারে। তিনি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এজন্যই জমা দিয়েছেন যাতে সরকার মতভেদ দূর করতে সত্বর কিছু সদর্থক ব্যবস্থা নিতে পারে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'কন্ধ' জনজাতিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কেননা, 'পাণ' জনজাতিরা খৃস্ট মতে মতান্তরিত হওয়ার পরেও জনজাতি হিসেবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকারে ভাগ বসাচ্ছেন। মহামান্য বিচারপতি মহোদয় সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, জনজাতিদের জমি জায়গা অ-জনজাতিদের কব্জা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস সত্বর শুরু করা হোক।

শ্রী মহাপাত্র সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁর অন্তর্বর্তী রিপোর্টে কন্ধমালে হিংসাত্মক ঘটনার দায় তিনি কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর নির্দিষ্ট করেননি।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, গতবছর ২৩ আগস্ট কন্ধমাল জেলার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী সন্ত স্বামী লক্ষ্মণানন্দ ও তাঁর চারজন অনুগামীকে রাত্রির অন্ধকারে দুস্কৃতীরা সশস্ত্র আক্রমণ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তারপর কন্ধমাল জেলা জুড়ে জাতিদাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। গত বছর ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মহাপাত্র তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম থেকে সরকারিভাবে হত্যাকান্ডে মাওবাদীদের জড়িত থাকার কথা বলা হয়েছিল। বিচারপতি মহাপাত্র তাঁর অন্তর্বর্তী তদন্ত রিপোর্টে কোনও ব্যক্তি, সংগঠন অথবা সরকারি দপ্তরকে দায়ী করেননি। যদিও তিনি ইচ্ছা করলেই তা করতে পারতেন। তবে সরাসরি দায়ী না করলেও তাঁর রিপোর্টে এটা স্পষ্ট যে, 'পাণ' জনজাতিদের খৃস্টমতে মতান্তরিত হওয়ার পরও জনজাতি হিসেবে জাল নথিপত্র দিয়ে তাবৎ সরকারি সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার মধ্যেই কন্ধমালের গোষ্ঠী সংঘর্ষের মূল কারণ নিহিত আছে।

উত্তরপ্রদেশের নেপাল-সীমান্তে মাওবাদী তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নেপালে দীর্ঘদিন ধরে চলা জনযুদ্ধে (Civil War) মাওবাদীরা মাদ্রাসাগুলির যোগসাজসে যে রণনীতির আশ্রয় নিয়েছিল, তা শুধু নেপালই নয়, ভারতের ক্ষেত্রেও গভীর সঙ্কট তৈরি করেছে। যার বিষময় ফল আজও ভারতকে ভুগতে হচ্ছে। এর ওপর কেন্দ্র সরকার, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের উদাসীনতা আরও বড় বিপদ ডেকে আনছে। উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী শ্রাবস্তী, বহরাইচ, বলরামপুর, বস্তী, সিদ্ধার্থনগর, গোরক্ষপুর, মহরাজগঞ্জ, লখিমপুর, পিলিভিটসহ প্রায় ১২টি জেলায় আই এস আই এবং মাওবাদীদের সক্রিয়তা বাড়া সত্বেও রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। ভারত নেপাল সীমান্তে অবস্থিত মাদ্রাসাগুলিতে ভারত বিরোধী কাজকর্মের চক্রান্ত চলছে বলেও বিশেষ সূত্রে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির (মাওবাদী) ছাত্র-সংগঠন অখিল নেপাল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র বিদ্যার্থী ইউনিয়ন-এর কার্যকর্তারা গত ২১ জুন ভারতে ঢুকে দলীয় পতাকা পুঁতে দেয় বলেও জানা গেছে। তারা সীমান্তের সীমারেখা চিহ্নিত তিনটি স্তম্ভ ভেঙে ফেলার চেষ্টা চালায়।

শ্রাবস্তী জেলার ওই তিনটি স্তম্ভের চিহ্নিত সংখ্যা হল ২১৮, ২২৩ ও ২২৪ নম্বর। ঘটনাটি ঘটে শ্রাবস্তী থেকে ৪৯ কিলোমিটার দূরের সোনপাথরীর কাছে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে'। যেখানে দু'দিকেই রয়েছে ১২ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ জঙ্গল। এই নো-ম্যানসল্যান্ডে না কোনও নিরাপত্তারক্ষী আছে, না আছে কোনও এসএসবি-এর পাহারা। নিরাপত্তার ছিটেফোঁটাও এখানেও দেখা যায় না। অথচ শ্রাবস্তী থানায় ইনচার্জ সুভাষ চন্দ্র জোর গলায় দাবী করেন যে, সেখানে নিয়মিত নজরদারি রাখা হয়।

শ্রীচন্দ্রের মন্তব্যেও যথেষ্ট বিতর্ক উঠেছে। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের অসঙ্গতিও লক্ষ্য করা গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে মাওবাদী ছাত্র-নেতারা কীভাবে ভারতে ঢুকল। আর কীভাবেই ভাবে থামগুলি ভাঙা হল। এদিকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এই ঘটনার কথা এস এস এস বি-র মাধ্যমে জানতে পেরেছেন বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান। এস এস বি-এর (গোরক্ষপুর) ডি আই জি শ্রী বি সাঁম বলেন, শ্রাবস্তীর এই ঘটনার কথা নেপালের ডাঙ্গ জেলার জেলাশাসককে শ্রাবস্তীর জেলাশাসকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকার বিষয়ে দুই জেলাশাসকের কথা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এই ঘটনার পর জেলা প্রশাসন কিছুটা হলেও নড়ে চড়ে বসে। শ্রাবস্তী জেলা সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। তবে উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত জেলা এখনও পুরোপুরি বিপদমুক্ত নয়। ২০০৫ সালে নেপাল রাজার বিরুদ্ধে মাওবাদীদের জনযুদ্ধের সময় তৎকালীন মাওবাদী এরিয়া কামাণ্ডার ডম্বর শর্মা তার বাহিনীকে নিয়ে সীমান্তে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই থেকেই এই সমস্যার সূত্রপাত। নেপালের বাঙ্ক, বর্দিয়া ও ডাঙ্গ জেলার বেশিরভাগ অংশ উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তী ও বহরাইচ-এর সীমান্তের খুব কাছাকাছি। ওই সব অঞ্চলে মাওবাদীদের প্রভাবও যথেষ্ট। এখানে মাওবাদীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাদ্রাসার সহযোগিতাও পায়। মাওবাদীরা নেপালকে সেকুলার রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পর, পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও, সীমান্তে ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের গেমপ্ল্যান তারা এখনও পাল্টায়নি। পাহাড়ী অঞ্চলের নেপালীরাও এখন বিভক্ত, যার ফায়দাও তুলতে চাইছে মাওবাদীরা।

সেন্ট্রাল বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম সারিতে বিদ্যাভারতীর ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'বিদ্যাভারতী' বিদ্যা দানের ক্ষেত্রে সবার থেকে এগিয়ে। তা সে ওড়িশা, অসম বা উত্তরাঞ্চল যেখানেই হোক না কেন। সেন্ট্রাল বোর্ডের ফাইন্যাল পরীক্ষায় বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ জুড়েই ভালো ফল করেছে। ওড়িশা রাজ্যের প্রথম ১০২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৪ জনই ওই রাজ্যে বিদ্যাভারতী পরিচালিত সরস্বতী মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী। রাজ্যের প্রথম দশজন স্থানাধিকারীর মধ্যেও বিভিন্ন পজিশনে রয়েছে মোট ২৯ জন ছাত্রছাত্রী। তারও ১৬ জনই ওড়িশার সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী।

এদের মধ্যে আবার রাউরকেল্লা সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র বিবেক বিশাল মেহেনা সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে। তারপরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে যথাক্রমে বারহামপুর সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সঙ্কেত দাস এবং বোলাঙ্গির সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অংশুমান ত্রিপাঠী। গতবছরও ওই দুটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম কুড়িজনের মধ্যে পনেরোটি স্থান দখল করেছিল। বিগত ছ'বছর ধরে পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-তুলনায় ক্রমাগত ভালো ফল সালে প্রথম শুরু হওয়ার পর 'বিদ্যাভারতী' পরিচালিত পারদর্শিতা দেখিয়ে এলেও আলোতে আসেনি। এসময় 'বিদ্যাভারতী' পরিচালিত আচার্যার সংখ্যা ১১০০ জন। শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-হাজার

ওড়িশার বিদ্যাভারতী ছাত্রীরা অন্যান্য স্কুলের করে আসছে। গত ১৯৭৮ থেকেই ওড়িশায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সেভাবে কখনও প্রচারের ওড়িশাতে ৭৩৯টি স্কুল চলছে। আচার্য-প্রাথমিক থেকে দশম ছাত্রীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০

দেরাদুন থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে উত্তরাখণ্ডেও হাইস্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায় যে ৬৩ জন র‍্যাঙ্ক পেয়েছে তাদের মধ্যে ৪৭ জনই 'বিদ্যাভারতী' পরিচালিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়া ইন্টারমিডিয়েট স্কুল পরীক্ষায় ৪৩ জন র‍্যাঙ্কিং-এ থাকা ছাত্র-ছাত্রীর ১৮ জন বিদ্যাভারতীর স্কুলের। প্রথম স্থান পেয়েছে অভিনব কালা। সে কোটদ্বার-এর মেহরাবন সিং কাণ্ডারী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। সাফল্যের হিসেবে বিদ্যাভারতীর স্কুলের ছাত্রদের ৯৪ শতাংশ সফলতা পেয়েছে হাইস্কুল পরীক্ষায় এবং ইন্টারমিডিয়েটে ৮৩ শতাংশ। এরকমই ভালো ফলের খবর পাওয়া গিয়েছে দিল্লী, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং অসম এবং আরও কয়েকটি রাজ্য থেকে।

'বিদ্যাভারতী' অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান-এর সাধারণ সম্পাদক জি এস রাওয়াল জানিয়েছেন তাঁদের পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫,৬২৪টি। তাঁর মধ্যে ৭৩৩টি উচ্চ-মাধ্যমিক। ১৯১৫টি মাধ্যমিক, ৪৪১১টি মিডল স্কুল। ৭০১৪ টি প্রাথমিক এবং ১৫৫১টি প্রাক্ প্রাথমিক এবং নার্সারি স্কুল সারা দেশে চলছে। সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা - ২৭, ৬৩, ৬২২ জন। এদের মধ্যে ২,৩৬,২৫৯ জন ছাত্র উচ্চ-মাধ্যমিক-এ। মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ২,৭০,৮৮৭ জন। মিডল্ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা - ৫, ৯৯, ৫৮৩ জন, প্রাথমিক-এ ১৩,৬৩,১৮৬ জন। নার্সারিতে ও প্রাক্ প্রাথমিক-এ ২,৯৩,৭৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করছে। মোট শিক্ষক (আচার্য-আচার্যা)-দের সংখ্যা ১,১৬,৮৫০ জন। এছাড়া বিদ্যাভারতীর পরিচালনায় সংস্কার কেন্দ্র হিসেবে ৯,৯৬০ টি ওয়ান টীচার স্কুলও চলছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এবং বনবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। এই সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ৩,৫৯,৩৯০ জন, শিক্ষকদের সংখ্যা ১০,৪০৫ জন। এছাড়াও বিদ্যাভারতী ২১৫টি আবাসিক বিদ্যালয় চালাচ্ছে। তার মধ্যে ১৫৭টি ছাত্রদের। ১৯টি ছাত্রীদের এবং ৩৯টি কো-এডুকেশন স্কুল রয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাওয়াল জানিয়েছেন, বিদ্যাভারতী গুণগতভাবে উচ্চমানের এবং নৈতিক সংস্কারযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

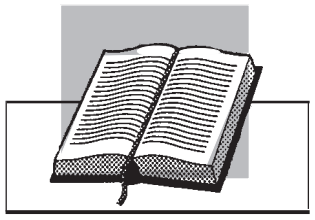

পুস্তক প্রসঙ্গ

আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষে এক অমূল্য গ্রন্থ

সাধনানন্দ মিশ্র

ভারতের আধ্যাত্ম গগনের অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে অন্যতম একটি জ্যোতিষ্ক ডঃ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তিনি তার জীবিতকাল ৯৬ বছরের মধ্যে ৮০ বছরই আশ্রমিক জীবন-যাপন করেছেন। সম্প্রতি তাঁর ১০৫তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। শ্রীমদ্‌ভাগবতের অতি মধুর অমৃতধারাকে তিনি শুধু নিজেই পান করেননি, সুদীর্ঘ জীবিতকালের মধ্যে অমৃতমাধুরী তাঁর মাধুর্যমন্ডিত বিদগ্ধ ভাষণ, ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ, পত্রাবলী প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে পরিবেশন ও বন্টন করে তাঁদের পূত পবিত্র করেছেন। ১৯৩৩ সালে চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে তাঁর ভাষণ অসীম বৈদগ্ধ্য ও বাগ্মিতার পরিচয়ে সমৃদ্ধ। বৈষ্ণবদর্শন ও হিন্দু শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। এবং সর্বোপরি নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা সেই সমূহ ভাবের চর্চা ও চর্যার অনুসরণ করে নিজেকে ভক্তসমাজে আচার্য ও গুরু রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ 'শ্রীমহানামব্রত পত্রাবলী'তে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের কাছে যে হাজার হাজার পত্র লিখেছেন, তার মধ্যে মাত্র ৬৩১টি পত্র পত্রাবলীর প্রথম খন্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের দ্বারা লিখিত পত্রে, পত্র সাহিত্য সম্ভার সুসমৃদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থসাহিত্যের পরিপূরক এই পত্রসাহিত্য। গ্রন্থে যা বর্ণনা করা যায় না, তা পত্রসাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজী তাঁর পত্রগ্রন্থের মাধ্যমে শিষ্য-শিষ্যা, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবদের জীবনতত্ত্ব, সাধারণতত্ত্ব, বিষয়সংকট ও বাস্তবজগতের নানা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন। এই পত্রসাহিত্যের পাঠকরাও পত্রলেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বহু মূল্যবান মণিমুক্তার দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারবেন। সংসারী মানুষের জীবনে বহু দুঃখ, শোক, অভাব-অভিযোগের মধ্যে থেকেও মানুষ এই সব উপদেশের দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করতে পারে, প্রেরণালাভ করতে পারে। পত্র প্রাপকদের মধ্যে কাউকে তিনি 'বাবা', 'দাদু', 'তোমাদের ছেলে', 'সন্ন্যাসী কাকু', 'শুভার্থী গুরুদেব' ইত্যাদিরূপে নিজের পরিচয় দিয়ে সকলের যেন আপনজন হয়ে গিয়েছেন। সকলকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে তাঁর গভীর হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও একজন ভক্তকে শাসন করবার ছলে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'ইন্দ্রিয় দমনের শ্রেষ্ঠ উপায় সৎ চিন্তা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ, আসন-ব্যায়ামাদি, ধ্যান-ধারণাদি ও ইষ্টমূর্তির ধ্যান এই কাজগুলি নিয়মিত করতে হবে। মনটাকে সর্বদা উর্দ্ধ ভূমিতে রাখিতে হইবে, তবেই রক্ষা। গায়ত্রীজপই মনকে উর্দ্ধভূমিতে রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।' একজন মাকে লিখিত পত্রে তার পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলছেন, 'পুত্র কন্যা সবই কৃষ্ণের। তিনি দেন তিনিই নেন। তাঁরই ধন তিনি তোমাদের পালন করিতে দিয়েছিলেন, সময় হইয়া গিয়াছে, যে কারণে আসিয়াছিল, মেয়াদ ফুরাইয়াছে, তাঁর ধন তিনি লইয়া গিয়াছেন। এই ভাবনা সত্য ভাবনা — ধৈর্য ধরিবার এই ভাবনাই মহৌষধ'।

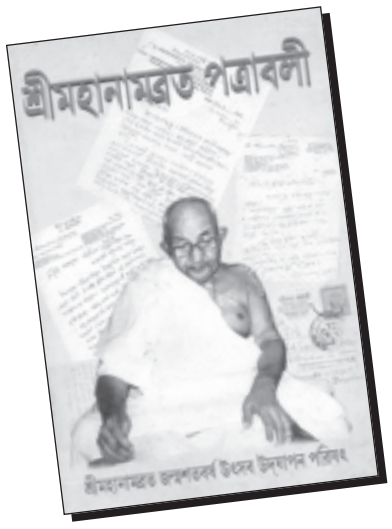

কোনও একজন ভক্তিমতী মহিলার উদ্দেশ্যে লিখছেন, 'অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানী — উহারা শুষ্ক, ভক্তিহীন, সঙ্গ করিলে ভক্তি লাভ হয় না। শুকাইয়া যায়, তবে যদি ঠিক অনুভব করিতে পার, কৃষ্ণকে ভালবাস, তবে যাইতে পার। কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্ত জগতে খুব বেশী নাই। আবার একজনকে লিখছেন, 'কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কথা যত কম বলিবে ততই ভালো। একাদশীর দিন মৌনী থাকিবে। একেবার কাষ্ঠ মৌন। মুখে সর্বদা মহানাম জপ করিবে। অন্তরে রূপ চিন্তা। ইহাতে চিত্ত শান্ত থাকিবে।' কখনও কোনও ভক্ত শিষ্যের ছেলের পরীক্ষায় খারাপ ফল হওয়ার জন্য তাকে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে গিয়ে লিখছেন, 'কোনও কারণেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, সংসারে উঠানামা, আঘাত, উত্থান দুই আছে। যতদিন বাঁচিবে দেখিতে থাকিবে। তোমাকে যুধিষ্ঠির হইতে হইবে। যুধিষ্ঠির অর্থ যুদ্ধে স্থির। প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণে স্থির, শান্ত থাকিয়া কঠোরভাবে জ্ঞান অন্বেষণ কর। মহান হবে। একাদশী তিথির পালনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একজনকে পত্র দিচ্ছেন — শ্রীহরির জন্য একটি বিশেষ দিন, তার হরিবাসর — একাদশী। ওইদিন আমরা শ্রীহরির সঙ্গে এক ঘরে বাস করিব। মনটা হরির পাদপদ্ম হইতে কোথাও যেন সরিয়া না যায় — এইভাবে চলিব। আমাদের নানাস্থানে চলিতে হয় প্রধানত আহারের চিন্তায়। ওইদিন আহার বাদ দিলে অনেক চলাফিরা কমিয়া যায়, আমাদের ছুটাছুটি বাড়ে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চ লতা হেতু। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে চিত্ত স্থির হয়, ছুটাছুটি কমিয়া যায়। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন — এই ১১টি ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া শ্রীহরির গৃহে তাঁহার সঙ্গে বাস করার জন্য একাদশী দিবস নির্দিষ্ট। যেখানে হরিনাম ও হরিকথা কীর্তন পাঠ হয়, সেই স্থানই হরির ঘর। সুতরাং ওইদিন আহার ত্যাগ করিয়া বা আহার সাধ্যমত কমাইয়া সারা দিন-রাত শ্রীহরির নামকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ লইয়া অতিবাহিত করাই একমাত্র কর্তব্য।'

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর গভীর

(এরপর ১৩ পাতায়)

নিত্যানন্দ গবেষণার সারাৎসার

নবকুমার ভট্টাচার্য

শ্রীকৃষ্ণের নাম নিত্য। এক এক লীলায় তাঁর এক এক নাম। সাধকগণ তাঁর নিত্য লীলাবিশিষ্ট এক একটি নাম গ্রহণ করেই ধ্যান করেন। সেক্ষেত্রে কোনও লীলাকে মায়িক আখ্যা দিলে তাঁর নামও মায়িক হয় এবং অনিত্যও হয়ে যায়। শ্রীজীবের গৌর তত্ত্ব ও স্বরূপ বিশ্লেষণ শ্লোক থেকে জানা যায় — "অন্তঃ কৃষ্ণং বহি গৌরং দর্শিতাঙ্গ দি বৈভবম্। কলৌ সংকীর্ত্তনৈযজ্ঞৈঃ কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতঃ।" এই ব্যাখ্যায় শ্রীজীব বলেছেন, কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যাঁর ভগবত্তা নিশ্চয় করেছেন। ভগবত্তাই যাঁর নিজের স্বরূপ, সেই স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করে অন্যত্র দুর্লভ অথচ তাঁরই করুণায় সুলভ প্রেম পীযূষ ধারা প্রকট হয়েছে। যিনি পরম অধিদেবতা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবানকেই শ্রীভাগবত শাস্ত্র কলিযুগের উপাস্য বলে নির্ণীত করে একাদশ স্কন্ধে ব্যক্ত করেছেন, আমি সেই পুরুষোত্তমকেই আশ্রয় করি। কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ। বুদ্ধি মান ব্যক্তিরা সেই গৌরাঙ্গ বিগ্রহেরই উপাসনা করেন। এ বিষয়ে শ্রীভাগবত আরও স্পষ্ট করে — তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন — ওরে নন্দ, (গর্গাচার্যের উক্তি) তোমার ছেলেটি প্রতি যুগেই আসেন। এক এক যুগে এর বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে জেনে রেখো এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে এসেছেন। সত্যযুগে আসেন শুভ্রবর্ণ নিয়ে। ত্রেতায় আসেন লোহিত বর্ণে। আর কলিতে? সোনার রঙে। এছাড়া অন্যবর্ণের তো উল্লেখই নেই বেদে।

ভাগবত পুরুষ এবং অবধূতের বেশধারী শ্রীনিত্যানন্দ। এঁকে সবার আগে অনুভব করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তাই তাঁরই অনুভূতির প্রত্যক্ষ মূর্তি — শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন করতে, শ্রীগৌরাঙ্গের মনে জাগে সেই মহাভাগবতের লক্ষণটি, তাঁর আচরণ দেখেই তিনি সবাইকে বলেন, "যিনি ভাগবত কথা শুনতে পাগল, বলতে পাগল, যিনি কখনও উন্মাদ, কখনও শিশু, কখনও নির্লজ্জ, কখনও সলজ্জ। যিনি কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন তিনিই ভাগবত অবধূত। চলুন সবাই, তেমনি মহাভাগবত পরমহংস অবধূত এসেছেন আমাদের নবদ্বীপে নিজেকে গোপন করে — অবস্থান করছেন এখানে, কবে বা চলে যাবেন, লোক প্রকাশ্য হয়েও এখন গুপ্তভাবে অবস্থান করছেন। চলুন চলুন দর্শন করে আসি তাঁকে। শ্রীগৌরাঙ্গের অনুভূত স্বরূপের প্রত্যক্ষ মূর্তি শ্রীনিত্যানন্দের এই অবস্থানটি বহু আগে থেকেই পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। যখন তিনি ভারতের প্রতিটি তীর্থ দর্শনের জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করছেন।

প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বৃন্দাবন লীলা সকল সব অনুকরণ করতে থাকেন কলিহত জীবের উদ্ধা র কামনায়। সেই লীলা বৈভবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন শৈশব অবস্থা হতে। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা শ্রীকৃষ্ণ সেবা শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্যা ব্যতীত তাঁর দ্বিতীয় কার্যই ছিল না। এই জন্য তাঁর গৃহত্যাগ। শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন হৃদয় প্রভু নিত্যানন্দের বিশ্ব প্রেমাবতার

বিষয়ক আলোচনা সমূহ নিত্যানন্দতত্ত্ব ও মানবতা প্রেমিক হৃদয়ের স্ফুরণের প্রকাশ ঘটেছে প্রণবানন্দ ঠাকুর রচিত প্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীখন্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায় বইটিতে। একশো দশ পাতার এই বইটিতে স্থান পেয়েছে পণ্ডিত রাখালানন্দ, গৌরগুণানন্দ, পণ্ডিত সর্ববানন্দ বাবাজীদের কথা। নিত্যানন্দ স্তুতিতে নিবেদিত ৫৬টি বৈষ্ণবপদের স্থান হয়েছে বইটিতে। এগুলি মূল্যবান সঙ্কলন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে বইটি অতি মূল্যবান।

প্রভু নিত্যানন্দ
ও শ্রীখন্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায়
লেখক: প্রণবানন্দ ঠাকুর
প্রাপ্তিস্থান : শ্রী নিত্যানন্দ জন্মস্থান কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিতাইবাড়ি। একচক্র। বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম ।। দাম: ৬০টাকা।

বইপাড়ার খবরাখবর

চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রকাশিত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মুদীর দোকান' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। রম্য বচনে উন্মোচিত আমাদের খাদ্যবস্তু ও আচারের গূঢ় রহস্য, যা লেখকের নিজস্ব কৌতূহল বহুমুখী চর্চার ফসল। এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন আর এক খাদ্যরসিক প্রতাপকুমার রায় এবং বইটির দাম ১৭৫টাকা। মহত্ত্ব আর আদর্শের আড়ালে লুকোনো থাকে চরিত্র। তার চতুরঙ্গ রূপ ব্যঙ্গচিত্রের আয়নায় ধরা পড়ে — যা দেখতে শেখায় সত্য, চিনতে শেখায় স্বরূপ। সেই সত্য ও স্বরূপের প্রতিবিম্ব 'বসন্তক' — আজ আর শুধুমাত্র কার্টুন চিত্রের সাময়িক পত্র নয়, এক ইতিহাসের নাম। নিউ এজ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'বসন্তক' সংগ্রহ টীকা চন্ডী লাহিড়ী। বইটির দাম ৪০০ টাকা। প্রতিভাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক গদ্য 'সিকি শতক সিকি ঝলক'। বইটির দাম ২০০ টাকা। কানাইপদ রায় রচিত 'উত্তর চব্বিশ পরগণার সেকাল-একাল বইটির ছয়টি খন্ড। ছয়টি খন্ডের মোট দাম ৮৭৫ টাকা। বইটির প্রকাশক প্রভা প্রকাশনী। বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন উপাখ্যান সম্বলিতসুধীর চক্রবর্তী রচিত 'মাটি পৃথিবীর টানে' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০০ টাকা। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গুলগল্পের সেরা সঙ্কলন 'গুল গপ্পো' প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী সম্পাদিত এই বইটির দাম ৭০ টাকা এবং পাওয়া যাবে দে বুক স্টোর থেকে। গৌরচন্দ্র সাহা রচিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রকাশিত হয়েছে। বইটির দাম ৩৬০ টাকা।

কোরানের কিছু বিষয়

কোরান কি এবং কোরানের বিষয়বস্তু কি এটা আমরা অনেকেই জানি না। কোরান না জানার ফলে আমরা অনেকেই মনে করি এটি একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু কোরানের সমস্ত বিষয়বস্তু জানলে ইসলাম ধর্মের অনেক মহিমা চুপসে যাবে। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — মুসলমান, মুসলমান ব্যতীত কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। যে কেউ এই নির্দেশ অমান্য করবে তার সাথে খোদার কোনও সম্পর্ক থাকবে না (৩:২৮)। আল্লার কাছে একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য (৩:১৯)। কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম গ্রহণ করতে চায় তবে তা মানা যাবে না (৩:৮৫)। দীপঙ্কর হোমচৌধুরী সঙ্কলিত সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় পবিত্র কোরানের কিছু বিষয় বইটিতে কোরনের সুরা ও আয়াত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে শব্দার্থমালা যাতে সমস্ত বিষয়টি বোঝা যায়। বইটি কোরানের একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান।

বইটির দাম ৭৫ টাকা। বইটি পাওয়া যাবে মীনা বুক ও স্টেশনার্স-এ। ঠিকানা : ২ নং বাজার, কল্যাণী, নদীয়া।

নকসাল বাড়ী থেকে লালগড়

বি পি সাহা

“আগে মাওবাদীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ হানতো এবং আক্রমণের পরেই পালিয়ে যেত এবং গোপন ডেরায় আত্মগোপন করে থাকতো। অর্থাৎ হিট এবং রান-এর কৌশলে তারা অপারেশন করতো। আজকে তারা বহু সংখ্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে টার্গেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আক্রমণ চালায়, গুলি বিনিময় করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে অর্থাৎ হিট ও রানের পরিবর্তে, তারা কনফ্রন্টেশনের কৌশল আয়ত্ত করছে।”

প্রয়াত কমরেড চারু মজুমদার ১৯৬৫-৬৭ সালের মধ্যে আটটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি নকসালবাড়ী আন্দোলনের স্রষ্টা। এই আন্দোলনের মূল আদর্শ, তিনি কার্লমার্ক্স লিখিত মেনিফেস্টো, রুশ বিপ্লবী লেনিন লিখিত স্টেট এণ্ড রেভিলিউশন এবং মাও-এর রেড বুক-এর উপদেশ ও নির্দেশ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এর মূল মন্ত্র, শ্রেণী শত্রুকে ধবংস করা এবং গেরিলারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈন্যদল গড়ে তুলে একের পর এক গ্রাম্য অঞ্চল মুক্ত করে ক্রমশ শহরাঞ্চল দখল করবে। নির্দেশনামায় তিনি বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন, ভারতে অনুষ্ঠিত বিপ্লবের নেতাগণ চীন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অধীনস্থ থাকবে। স্মরণ করা যেতে পারে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান।”

দার্জিলিং জেলার নকসালবাড়ীতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি। কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রভৃতি এই আন্দোলনের

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চীন নকসালবাড়ি আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল এবং ওই দেশের সংবাদপত্রে এর প্রচার ফলাও করে করা হয়েছিল। পিপলস্ ডেইলী, ৫ জুলাই ১৯৬৭ সালের সম্পাদকীয়তে ভারতের প্রথম বিপ্লবের সূচনায় উচ্ছ্বাস ও আবেগকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, হিমালয়ের হিন্দু রাজ্য নেপালে কার্যরত চীন দেশের এমব্যাসির মাধ্যমে চীন সরকার অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, প্রয়োজনীয় উপকরণ ভারতের নকসালপন্থীদের কাছে পৌঁছে বিপ্লবকে সাহায্য করেছিল। কানু সান্যাল, সৌমেন বসু এবং আরও ছয় জন নকসালপন্থী নেপাল থেকে চীন দেশে প্রবেশ করে দীর্ঘ তিন মাস কাল প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতে ফিরে আসে। কানু সান্যাল, নেপালের ভদ্রপুরে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে নেপালের উগ্রপন্থী ও ভারতের নকসালপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। নেপালের উগ্রপন্থী ও ভারতের নকসালপন্থীদের মধ্যে গভীর আদান প্রদানের এক সুষ্ঠু ও কার্যকরী বাতাবরণ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ও চরমপন্থী আন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, যে সকল নেতা নকসাল আন্দোলন বা পরবর্তী রক্তাক্ত আন্দোলনে অংশ নেয়, তারা সকলেই প্রথম অবস্থায় সি পি আই বা সি পি আই (এম)-এর নেতা বা সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এদের অধিকাংশই দল ছুট হয়ে বা দল থেকে বহিস্কৃত হয়ে রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসে যুক্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় ছোট ছোট দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তাক্ত উগ্র আন্দোলনের সূচনা করে। এদের সঙ্গে চারু মজুমদার ও নকসাল আন্দোলনকারীদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। তৃতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে নকসাল নেতাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাবে বিপ্লব আন্দোলনে যথেষ্ট বৈরী প্রভাব পড়ে। মতবিরোধ এবং দল ছেড়ে নতুন দল গড়া, অন্তর্দ্বন্দ্ব, খুনোখুনি ইত্যাদি আন্দোলনকে পিছনে ফেলে দেয়।

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব নকসাল আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ফলে চীন চারু মজুমদারের শ্রেণী সংগ্রাম ও রক্তপাতকে সমর্থন করতে গররাজি হয়। কমরেড সত্যনারায়ণ সিংহ চারুর সঙ্গে সহমত হতে না পেরে, সম্পর্ক ছেদ করে বিহার রাজ্যে আলাদা ভাবে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। কানু সান্যাল ২২ এপ্রিল ১৯৬৯ সালে কলকাতায় সি পি আই (মার্কসিস্ট-লেলিনিস্ট) দলের পত্তন করেন। কমরেড কানাই চ্যাটার্জি ও অমূল্য সেন দল পরিত্যাগ করে আলাদা ভাবে আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীকালে এরা বিহার রাজ্যের ভোজপুর এলাকায় আন্দোলন আরম্ভ করে এবং এম সি সি সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলে। বিহারে কমরেড বিনোদ মিশ্র ১৯৭৬ সালে সি পি আই (এম এল লিবারেশন)-এর সূচনা করে আন্দোলন চালাতে থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশে কে সীতারামাইয়ার নেতৃত্বে ১৯৮০ সালে পি ডব্লিউ জি, জনযুদ্ধ আত্মপ্রকাশ করে। জনযুদ্ধ ও বিহারের এম সি সি বোঝাপড়ার মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশে গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

নেতৃত্বের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে নকসাল আন্দোলন প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসে। এম সি সি নেপালের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। ১৯৯৬ সাল থেকে নেপাল রাজ্যে মাওবাদীরা বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠে এবং রাজতন্ত্রকে উৎখাৎ করতে ধবংসাত্মক কার্যকলাপ বেশ জোরের সঙ্গে চালাতে থাকে। ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এবং মহারাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের শক্তি অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে উগ্রপন্থীদের শক্তি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠে। বিভিন্ন রাজ্যে ছোট ছোট দলে বা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা, লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও জনতার দরবারে মানুষকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসীদের সামনে বিচারের প্রহসন ও মৃত্যুদণ্ড শান্তিকামী জনগণকে ভীত ও অসহায় করে তোলে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আন্দোলনের অসুবিধা, বিশাল ও একত্রিত শক্তির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করা হয়। এছাড়া, আদর্শ ও লক্ষ্য যখন এক, সেখানে সম্মিলিত শক্তি ও প্রচেষ্টায় বাধা বা আপত্তি কোথায়? পি ডব্লিউ জি এবং এম সি সি, আলাদা দুটি সংগঠন মিশে গিয়ে যৌথভাবে আন্দোলন চালালে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়বে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে, বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে অবশ্যই সুবিধা হবে। সে সব কারণে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে জনযুদ্ধ ও এম সি সি মিশে এবং একত্রিত হয়ে এক নতুন সংগঠনের সূচনা হয়, যার নামকরণ করা হয়েছে সি পি আই (মাওবাদী)। অর্থাৎ নকসালবাদীদের অস্তিত্ব শেষ হয়েছে, এখন ultra left extremists-দের চিহ্নিত করা হয়েছে মাওবাদী নামে। উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গে নকসালপন্থীদের প্রথম উত্থান হলেও, আজ তাদের অবস্থা উৎপত্তিস্থলেই প্রায় মরণোন্মুখ। রাজ্যে মাওবাদীদের নেতৃত্বে কোনও বলিষ্ঠ নেতা নেই। জনযুদ্ধ ও এম সি সি-র একত্রীকরণে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নেই বললেই চলে।

দেশে মাওবাদীদের বিস্তার কয়েকটি বিশেষ কারণে ঘটেছে। প্রথমত দীর্ঘ ৬২ বছর স্বাধীনতা লাভের পরেও জনতার বৃহৎ অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে। দারিদ্র্য শোষণ, বিত্তবান ও প্রভাবশালী মানুষের আধিপত্য দুঃস্থ ও শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে। আজও মানুষ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে মৃত্যুবরণ করে। এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ফুলে ফেঁপে উঠে, অবশিষ্টরা দুঃখে- কষ্টে গুমরে মরে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমস্যার মূলে না গিয়ে শুধু পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এর সমাধানের চেষ্টা করছে। এটা যে, মোটেই আইন শৃঙ্খলা ও অপরাধ দমনের সমস্যা নয়, এই অন্তর্নিহিত সত্যকে রাজনৈতিক নেতাগণ আমল দিতে নারাজ। অন্তর্ঘাতের খবর পেয়ে কিছু সংখ্যক পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে এবং কিছু অর্থ বরাদ্দ করে তারা কর্তব্য পালন করতে উৎসাহী। সরকারে অদূরদর্শিতা ও মূল সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করার অক্ষমতা সারা দেশে উগ্রপন্থীদের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে।

আজকে ১৬টি রাজ্যে এবং ১৬৬টি জেলায় মাওবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। নেপাল থেকে তামিলনাড়ুর ধরমপুর জঙ্গল পর্যন্ত মাওবাদীদের লম্বা গলি বা করিডর সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় মুক্তাঞ্চল। মুক্তাঞ্চলে মাওবাদীদের শাসন চলে। অর্থাৎ, এখানে সরকারি শাসন প্রায় অচল। সরকারী কর্মীরা সন্ধ্যার পরে মুক্তাঞ্চলে প্রবেশ করে না। মাওবাদীদের ক্যাডার প্রায় ২.৫ লক্ষ থেকে তিন লক্ষ সংখ্যায় রয়েছে। বছরে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা তারা জোর করে বা ভয় দেখিয়ে আদায় করে। অনেকে ভয়ে এবং বাধ্য হয়ে নিয়মিত অর্থ যোগান দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। পূর্বে মাওবাদীরা বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক সংগ্রহ করতো, আজকে দেশের গুপ্ত ঘাটিগুলিতে আধুনিক অস্ত্র তৈরী করা হয়, ল্যাণ্ডমাইন জোড়া দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষকদের হাতে ক্যাডারকুল প্রশিক্ষণ পেয়ে পাকা গেরিলা হয়ে উঠে।

আগে মাওবাদীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ হানতো এবং আক্রমণের পরেই পালিয়ে যেত এবং গোপন ডেরায় আত্মগোপন করে থাকতো। অর্থাৎ হিট এবং রান-এর কৌশলে তারা অপারেশন করতো। আজকে তারা বহু সংখ্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে টার্গেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আক্রমণ চালায়, গুলি বিনিময় করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে অর্থাৎ হিট ও রানের পরিবর্তে, তারা কনফ্রন্টেশনের কৌশল আয়ত্ত করছে। আক্রমণের পরে পালিয়ে যায় না। দ্বিতীয়ত, ল্যাণ্ডমাইন ও বিস্ফোরক ব্যবহারে তারা সুকৌশলী, এতে তারা যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। ২০০৯ সালে, অর্থাৎ এ বছর ২০ জুন পর্যন্ত ১৮৪ জন নিরাপত্তারক্ষী তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে এবং কয়েক ডজন স্কুল বাড়ী ও সরকারী অফিস বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ বা ধবংস করা হয়েছে। এইভাবে মাওবাদীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের শক্তিবৃদ্ধি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এক গভীর চ্যালেঞ্জের সামিল।

(লেখক ঃ ওড়িশা পুলিশের প্রাক্তন আই জি)

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি

মার্কসবাদের পূজারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন হওয়ার পর রাজ্যের উন্নয়ণে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাদের প্রায় সবগুলিই 'ফ্লপ' করেছে। তাঁর পূর্বসূরী জ্যোতি বসু ছিলেন কৃষিপ্রেমী। তাই কৃষকদের হাত ধরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী রূপে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছেন দু'যুগ। কিন্তু বুদ্ধবাবু আবার শিল্পপ্রেমী। কাজেই শিল্পহীন এ রাজ্যে শিল্পের জোয়ার আনতে তিনি রাতারাতি ডেকে এনেছেন দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এরাজ্যে এসেছেন টাটা-সালিম-বেনি সন্তোষারা। কিন্তু বহু কৃষক জমি দিতে রাজি না হওয়ায় তাদের উপর সি পি এম ক্যাডাররা চালিয়ে দেয় দমন-পীড়নের স্টীম-রোলার। অহিংস সেই আন্দোলনকে ক্যাডার, পুলিশ দিয়েও স্তব্ধ করা যায়নি। ন্যানো গাড়ি তলিয়ে যায় বিশবাঁও জলে।

অতঃপর নন্দীগ্রামে শিল্পতালুক গড়ার ডাক পায় সালিম গোষ্ঠী। কিন্তু জমি ছাড়তে অনিচ্ছুক কৃষকরা সরকারের অশুভ প্রয়াসের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে ব্যাপক আন্দোলন এবং তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সিপিএম বিরোধী জনগণ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরা। ক্যাডারদের পৈশাচিক অত্যাচার উৎপীড়নে জনগণ এতটাই ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ ও মারমুখী হয়ে ওঠে, যাকে স্তব্ধ করতে বুদ্ধবাবু লেলিয়ে দেন পুলিশ ও ক্যাডারদের। পুলিশ ও পুলিশের উর্দি পরা সশস্ত্র ক্যাডাররা গুলি চালিয়ে হত্যা করে অনেক প্রতিরোধকারী নারী, পুরুষ ও শিশুকে। আহতও হয় বহু। স্বজন হারানো ও বিক্ষুব্ধ জনতার রোষের আগুনে মুখ পোড়ে বুদ্ধবাবুর।

শিল্পপ্রেমী বুদ্ধবাবু এন্ড কোম্পানী কৃষক, শ্রমিক ও মুসলিম হত্যার ফল পেয়ে যান হাতেহাতে। পঞ্চায়েত, উপনির্বাচন, লোকসভা ও পুরসভার নির্বাচনে সি পি এমের ঘটে চূড়ান্ত ভরাডুবি। কিন্তু অপ্রত্যাশিত সেই ভরাডুবি থেকে উদ্ধার পেতে বিরোধীদের উপরে নামিয়ে আনা হয় ক্যাডার-পুলিশের বীভৎস নির্যাতন। গোর্খাল্যান্ডের দাবী মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও সমস্যা সমাধানে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বুদ্ধবাবুর সরকার। উল্টে মাওবাদী দমনে লালগড়ে পাঠিয়েছে সশস্ত্র পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু ওই যৌথবাহিনী মাওবাদীদের নাগাল না পেলেও মাওবাদী সন্দেহে ধরছে ও মারছে নিরপরাধ গ্রামবাসীদের। ফলে জঙ্গলমহলের মানুষও ফুঁসছে।

আলুর দাম সর্বকালের রেকর্ড করায় সরকার ১৩ টকা কিলো দরে আলু বিক্রির ব্যবসায় নেমেছে। কিন্তু কজন ওই দরে আলু পেয়েছে? এটাকে লোকঠকানো কারবার বা ভন্ডামি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? মঙ্গলকোটে কংগ্রেস বিধায়কদের উপর ক্যাডারদের বর্বরোচিত আক্রমণ বুদ্ধবাবুর প্রশাসনকে করে দিয়েছে আরও উলঙ্গ।

বাসভাড়া বৃদ্ধিতেও জনগণ ক্ষিপ্ত। সরকারের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপই যাচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে। তাই বুদ্ধবাবুর সরকারের ক্ষেত্রে আজ একটা কথাই প্রযোজ্য — 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

ভারতে সমকামিতার স্বীকৃতি

সামাজিক বিবর্তন যুগে যুগে হয়েছে, হবেও। ভারতে ইতালিয়ান সভ্যতা আমদানির যুগে এক নতুন বৈপ্লবিক নগ্নতা সমাজে আইনের সমর্থনে প্রবেশ করল। তা হচ্ছে সমলৈঙ্গিকতা।

সৃষ্টির আরম্ভ কাল থেকে স্বেদজ অন্তজ জবাউজ ও উদ্‌বীজ যে কোনও প্রাণীর বংশবৃদ্ধির জন্য নারী পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণকেই কারণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। তা থেকে মানব সমাজে বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পুরাণে একটা গল্প আছে। ভগবানের অনেক অবতারের মধ্যে ভগবান নারায়ণের মোহিনী অবতারও এক ঘটনা। সেই অনিন্দ্যসুন্দর নারী রূপ দেখে সাক্ষাৎ দেবাদিদেবেরও হোম উৎপন্ন হয়েছিল এবং ঐ হরিহরের মিলনে মোহিনীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন ভগবান 'ঐয়াপ্পা'। ঐয়াপ্পার প্রশ্ন ভগবান বিষ্ণু তো আমার মা এবং দেবাদিদেব মহাদেব আমার পিতা। তাহলে নারায়ণী লক্ষ্মী ঠাকুরুণ আমার কে হন?

প্রকৃতির প্রতিকূল এই সমকামিতার ফলে কি ছেলেরা গর্ভধারণ করবে? মেয়েরা সমকামী হলে নিশ্চয়ই কৃত্তিম উপকরণ ব্যবহার করবে। আর যদি মাতৃত্ব চায় তবে বর্তমানে প্রচলিত গো-প্রজননের মতো কোনও উপায় অবলম্বন করবে। সেটা কি কোনও মনুষ্য সমাজ মেনে নেবে? ধর্মীয় দৃষ্টিতে খৃস্টান ধর্মগুরুরা তাদের বিরোধ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সংসদে যোগী আদিত্যনাথও বিরোধ করেছেন হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে। হয়তো ইসলাম ধর্মগুরুরাও বিরোধ করবেনই। কারণ যদি মেয়েরা সমকামী হয় তবে তাদের চার বিবি রাখার যে ধর্মীয় অধিকার তা ক্ষুণ্ণ হবে। ভারত সরকারও একসঙ্গে এক বিবি রাখাকে মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে পারেনি। তা সেটা ভোট হারাবার ভয়েই হোক বা প্রাণ হারাবার ভয়েই হোক।

মানুষ কুকুর এবং নেকড়ের প্রজনন ঘটিয়ে হেলসিশিয়ান নামক এক সঙ্কর কুকুর জাতির সৃষ্টি করেছে, ঘোড়ার সঙ্গে গাধার প্রজননে খচ্চর প্রজাতির পশুর উৎপত্তি। গাছের কলম করে করে সঙ্কর প্রজাতির ফল-ফুল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পুংকেশর ও আরেকটা পুংকেশরের সঙ্গে মিশিয়ে কোনও লাউ-কুমড়ো, ঝিঙ্গে, পটল বা কাঁকরোলের মতো সবজি উৎপন্ন হয় না। নবজন্ম ঘটাতে গেলে সেখানেও নারী-পুরুষেরই মিলন ঘটাতে হবে।

আমার বিনম্র অনুরোধ, মনুষ্য সমাজের কল্যাণের জন্য, নীতিবোধ প্রাকৃতিক প্রেম ভালবাসা ও সমাজ ব্যবস্থার সুরক্ষার জন্য হাইকোর্টের এই রায়কে যেন দলমত নির্বিশেষে সকল সাংসদগণই একবাক্যে বাতিল করে দেন।

এই রায় ন্যায়ালয়ের অধিকার ভুক্ত হতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতি তার ঘোরতর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। নানা অঘটন ঘটবে, নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। বিবাহ না করেই যেমন অনেক দেশে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ও সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করার মতো জঘন্য জীবন ঘটছে তা হয়তো ভারতেও হবে। যাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হবে না।

স্বামী অশোকানন্দ, কলকাতা।

ওয়াকফ সম্পত্তি কী খোদার সম্পত্তি

বাংলাকে খোদার রাজ্যে পর্যবসিত করতে ওয়াকফ সম্পত্তির প্রতি সরকার বাহাদুর সদা জাগ্রত। ১৭৯৬ সালের প্রপ্লপ্লনন রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, বৈষ্ণবোত্তর সম্পত্তি, মহাত্রাণ সম্পত্তি, গণকোত্তর সম্পত্তি ও সন্ন্যাসোত্তর সম্পত্তির সাথে সাথে ওয়াকফ সম্পত্তিকেও করমুক্ত সম্পত্তি বলে সরকার ঘোষণা করেছিল। স্বাধীন ভারত শুধুমাত্র বাংলাকে খোদার রাজ্য রূপে গড়ে তোলার জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে তাই দেখভাল করছে। যেমন পাকিস্তানের করাচিতে ১৯৪৭ সালে ৪৫৬টি মন্দির ছিল। আর তা খোদার রাজ্য রূপে স্বীকৃতি পাওয়ায় বর্তমানে ২০-২৫টি মন্দির আছে। ১৯৪৭ সালে দেবোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আজ কী অবস্থা তা নিয়ে কী কমিশন গঠন হবে?

রাধাকান্ত ঘোড়াই, ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৩৪।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক

৬ জুলাই স্বস্তিকায় নবকুমার ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' প্রকাশিত। এ সম্পর্কে বিগত উনিশ বছর ধরে কাজ করছি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে গ্রামীণ মুসলমানদের চিন্তাচেতনার যে বিবর্তন ঘটে তা লিপিবদ্ধ করি সর্বপ্রথম 'নবরূপে তিতুমীর' পুস্তকে। এ ব্যাপারে শেষতম পুস্তক 'বাঙলার মাটিতে ইসলামের উদয় ও বিকাশ'। মূলত ওয়াহাবী ও ফরাজি আন্দোলনের ফলে বাঙলার মুসলমানরা শরিয়ৎমনস্ক হয়ে ওঠে; নতুবা পির ও মুসলমান মাতব্বর দ্বারা ইসলামায়িত বাঙলার গ্রামীণ মুসলমানরা ইসলামের অ আ ক খ কিছুই জানতো না। ফরাজী আন্দোলন শুরু হয় ১৮১৩ সাল নাগাদ; আর তিতুমীর বাঙলায় ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করে ১৮২৭ সাল নাগাদ। ঐ দুটি আন্দোলন নিয়ে সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও প্রবলভাবে বাধা দেয় ঐ ইসলামী মৌলবাদীদের। সুতরাং, "তখনকার হিন্দুসমাজ এ ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামায়নি" বা "নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বিরোধ নিয়েই তখন বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা" এ সব কথা আজগুবি। ইসলাম মক্কা-মদিনা কেন্দ্রিক বিশ্বধর্ম — পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম মুসলমানটিও বিশ্বজনীন ইসলামী উম্মার বা সংঘের সদস্য। তার গায়ে আঁচড়টি পড়লে গোটা বিশ্ব নড়ে চড়ে উঠবে। তুলনায় হিন্দুরা হাটতলায় পড়ে থাকা পতিতা। যে কেউ তাকে যা খুশি তাই করতে পারে। ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের বিকিরণ ফলে বাঙলার গ্রামীণ মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যমুখী হয়ে ওঠে। নিজেদের আরবীবদন ভাবতে থাকে। তারা অস্বীকার করে নিজেদের বাঙালিত্বই। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতিমাপূজক হিন্দুদের শত্রু বলেও ভাবতে থাকে। কারণ, কোরানে আছে, অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু (কোরান-৪.১০১)। বাঙলার গ্রামীণ মুসলমানরা ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করতেন জনসাধারণকে ইসলাম বোঝানোর জন্য।

একজন লিখলেন, আমাদের মোছলমানি বড়ই রোশনাই। হামেশা হিন্দুর দিনে দেই মরা ছাই। এছা পছা আক্কেল তেরা শোনরে বেহায়া। কাফিরের কথা শোন মোছলমান হইয়া। (দিন—ধর্ম) সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই মুসলমানরা হিন্দুদের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যায়।

ইসলাম যেহেতু 'বৈশ্বিক মত', তাই কোনও স্থানীয় জাতীয়তাবাদের শরিক মুসলমানরা হতে পারে না। কোরানে বলা আছে, বিধর্মীর আনুগত্য স্বীকার করো না, তাদের বিরুদ্ধে কোরানের সাহায্যে যুদ্ধ করে। মুসলমানরা একটি বিশ্বজোড়া পৃথক জাতি, এ জাতির নাম মিল্লি। সৈয়দ আমীর আলি এবং সৈয়দ আহমদ খাঁ হিন্দু-মুসলমান দুটি পৃথক জাতি বলেছিলেন। নির্বোধ হিন্দুরা কোরান-হাদিশ না পড়ে মুসলমানদের নিয়ে জাতিগঠন করতে চেয়েছিল এবং আজও সেই খোয়াব দেখছে। তারা বলে, যতো মত ততো পথ; বসুধৈব কুটুম্বকম্। মিশ্র সংস্কৃতি!

গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মুসলমানরা মানসিকভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে সেই পরানুকরণমনস্কতা রাজনৈতিক রূপ পায়। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়। এর মধ্যে বৃটিশের কোনও ভূমিকা নেই। কঙ্গীরা ইসলাম না বুঝে প্রচার করে বৃটিশরা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' করেছে। স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের মনে এইভাবে মিথ্যা ঢোকানো হচ্ছে।

ডঃ রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, নবপল্লী, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যায় 'এন সি দে' রচিত 'স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতির রূপকার শ্যামাপ্রসাদ' প্রবন্ধে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি চোখে পড়েছে। প্রবন্ধে এক জায়গায় বলা হয়েছে, বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে ডাকেননি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সময় গান্ধীজির বয়স ছিল ষোলো বছর। জাতীয় রাজনীতি বা জাতীয় কংগ্রেসে কোথাও তখন গান্ধীজীর কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে ডাকা হয়নি সত্য, কিন্তু তার দায়িত্ব ষোলো বছরের গান্ধীজির ওপর বর্তায় না। প্রসঙ্গত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫-তে আর গান্ধীজির জন্ম হয়েছিল ২ অক্টোবর ১৮৬৯-এ।

অম্লানকুসুম ঘোষ, বালি, হাওড়া।

সমাবেশ সমাচার

গো-গ্রাম যাত্রার প্রশিক্ষণ বর্গ

গো-আধারিত গ্রাম বিকাশ, তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিকাশ এবং ভারতের মঙ্গলের মাধ্যমে বিশ্বমঙ্গল আর এই জন্যই শুরু হচ্ছে "বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা"। এই যাত্রাকে সুচারু এবং সফল করার জন্য বিভাগ অনুসারে প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ১০ থেকে ১৩ জুলাই উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে উত্তরবঙ্গ জেলা সংযোজন সমিতির সদস্য তথা প্রমুখ কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। গরু কতভাবে আমাদের উপকার করে এবং কিভাবে শুধুমাত্র একটি গরুর একবছরের গোবর, গোমুত্র থেকে যে কেউ দিনে ৩০ মিঃ পরিশ্রম করলে মাসে ২০০০ টাকা আয় করতে পাবে — সে সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সহজ ভাবে সবার সামনে রাখেন এই যাত্রার সর্বভারতীয় যাত্রা প্রমুখ রাঘবনজী। এই যাত্রার তিনটি ক্ষেত্রের প্রমুখ ভাস্কর কুলকার্ণী যাত্রার সাংগঠনিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই প্রশিক্ষণ বর্গে প্রান্ত ধর্মজাগরণ প্রমুখ রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, রোহিণী প্রামাণিক, প্রান্ত সহকার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মোট ১০২ জন কার্যকর্তা এই বর্গে যোগ দেন।

এই যাত্রার কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল মানসিংকা শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। পরে স্থানীয় গোশালায় যান।

ভারত বিকাশ পরিষদ

ভারতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই দীর্ঘদিন ধরে সেবামূলক কাজ করে চলেছে ভারত বিকাশ পরিষদ। গত জুলাই ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দমদম সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছোট ছোট ভাই-বোনদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারত বিকাশ পরিষদের কলকাতা শাখার সভাপতি সুনীল সিংহানিয়ার নেতৃত্বে অন্যান্য কার্যকর্তারা। কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে এদিন একটি ব্লাকর্বোড সহ শিশু ভাই-বোনদের হাতে খাতা-পেনসিল তুলে দেওয়া হয়। আগামীদিনে শ্রদ্ধা ভালবাসার সাথে স্কুলের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও তারা দেন।

কণ্ঠস্বরের সাহিত্য সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সাহিত্য কণ্ঠস্বরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ জুলাই জীবনানন্দ সভাঘরে আয়োজিত হয় এক সাহিত্যবাসর। উপলক্ষ কবি সাংবাদিক ও সম্পাদক সত্যরঞ্জনের সঙ্কলিত প্রবন্ধের গ্রন্থ প্রকাশ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সমকালের আরেক বিশিষ্ট কবি উত্তর বসু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি অমিয় সান্ন্যাল, লিটল ম্যাগাজিনের প্রসিদ্ধ গীতিকবি ঋষি মিত্র প্রমুখ। গ্রন্থ প্রকাশ ও সত্যরঞ্জনের জীবন ও কর্মের স্মৃতিচারণ পর্বের পরে কবিতায়, গানে, আবৃত্তি তে আসর জমিয়ে দেন অমল কর, রথীন কর, সুমনা পাল,কিংশুক রায়চৌধুরি, দীপেন ভাদুড়ি, পরিমল ঘোষ, শঙ্কর সাহা, বেবি দাস, সমীর ব্যানার্জী, রানা চট্টোপাধ্যায় সহ বহু প্রতিষ্ঠিত গুণীজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৪০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ হয়ে চলা 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে এক বিশেষ মাত্রার সঞ্চার করেছে। অনুষ্ঠানে সত্যরঞ্জন ও তার মানসপুত্র কণ্ঠস্বরের বহুমাত্রিক গুরুত্বের কথা আলোচনা করেন তার কন্যা অনন্যা বিশ্বাস ও গল্পকার সুকুমার রুজ।

মঙ্গল-নিধি

১ জুলাই আসানসোল মহকুমা সঙ্ঘচালক লক্ষণলাল গুপ্ত এক হাজার এক টাকা 'মঙ্গলনিধি' প্রদান করেন। এদিন তাঁর নাতনী 'নম্রতা-র সঙ্গে পাত্র প্রভাত জৈনের বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। জেলা সঙ্ঘচালক মদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই 'মঙ্গলনিধি' গ্রহণ করেন।

❖ ❖ ❖

গত ১১ মে ২০০৯ আসানসোলের বিদ্যানন্দপুর গ্রামের স্বয়ংসেবক অসীম সরকারের বিবাহ অনুষ্ঠানে এক হাজার এক টাকা 'মঙ্গলনিধি' রূপে প্রদান করা হয়। আসানসোল জেলা প্রচারক তরুণ মুখোপাধ্যায় এই অর্থ গ্রহণ করে বিবেকানন্দ সেবা ভারতীকে প্রদান করেন। উল্লেখ্য, অসীম সরকারের দাদা অমিত সরকার সঙ্ঘের প্রচারক। হাসনাবাদ মহকুমা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

অমরনাথের অমরালয়ে

সোমনাথ নন্দী।। কে বলে ঈশ্বর নেই। তাঁর ডাক, তাঁর কথা আদৌ কি পৌঁছায় ভক্তদের কর্ণকুহরে। প্রশ্নটা বর্তমান কালের জড়বাদী মানুষদের। ধর্মপথের পথিক যাঁরা, তাঁরাও কি মুক্ত সকলে এই সংশয়ের ব্যূহ হতে?

বাস্তব বলে অন্য কথা। তীর্থ দেবতার আহ্বান যদি না আসে, কেন যান মানুষ হাজারে হাজারে তীর্থদেবকে এক লহমা দর্শনের আশায় দুর্গম সব তীর্থে। যেখানে বিপদ পদে পদে। সে প্রাকৃতিক দুর্যোগে হোক্, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ হোক, পাহাড়ী ধস হোক বা আধুনিক কালের সন্ত্রাসবাদীদের নির্মম হত্যার বিভীষিকা হোক। সব উপেক্ষা করেই তো পৌঁছান তাঁরা তীর্থদেবতার আলয়ে। কাঙ্ক্ষিত দর্শন কামনায়। এ আকাঙ্ক্ষা কি দেবতার সপ্রেম ডাক নয়।

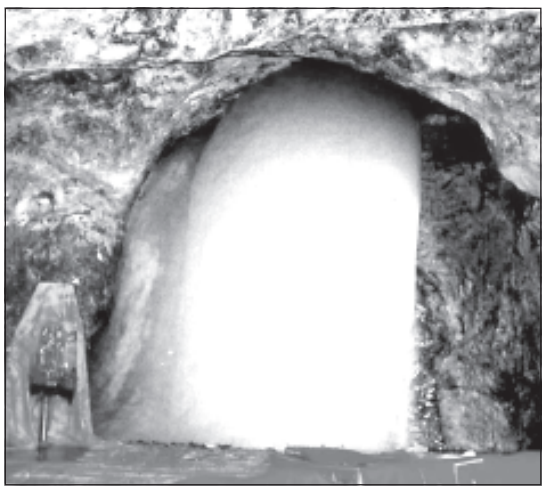

অমৃতরূপী সে দেবতার আহ্বান যে অমোঘ, অব্যর্থ — সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। পারেননি ভৃগু, মার্কন্ডেয়, কাশ্যপ প্রমুখ পৌরাণিক ঋষিরা। থাকেননি শঙ্করাচার্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভারতের আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের মহানায়করা। তাঁদের দেবসম্ভূত সত্তা সেদিন তীর্থপতি বিশ্বদেবতার মহাসত্ত্বার সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিগ্রহ করেছিল মিলনীভূত অমৃতময় রূপ।

হিমাচ্ছন্ন কাশ্মীর হিমালয়ের উত্তর-পূর্বে দুর্গম গুহাতীর্থে যে অভিজ্ঞতায় মুখোমুখি হয়েছিলেন যুগপুরুষ স্বামী বিবেকনন্দ। মানসকন্যা নিবেদিতাকে বলেছিলেন — "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি। আমার মনে হইতেছিল তুষারলিঙ্গ টি সাক্ষাৎ শিব। আর তথায় কোনও বিত্তপহারি ব্রাহ্মণ ছিল না। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব ছিল। আর কোনও তীর্থক্ষেত্রে এত আনন্দ উপভোগ করি নাই" (স্বামিজিকে যেরূপ দেখেছি)।

স্বামীজি নগাধিরাজ হিমালয়ের সেই দেববাঞ্ছিত তীর্থে যান ১৮৯৮ সালের ২ আগস্ট, মঙ্গলবার। রাওয়ালপিন্ডি (পাকিস্তান), বারামূলা, শ্রীনগর হয়ে পৌঁছান এখানে। তখন পথ ছিল অতি ভীষণ বিপদসঙ্কুল। সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও পাশ্চাত্যবাসী কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যা। দেবদর্শনান্তে স্বামীজি একান্তে বলেছিলেন নিবেদিতাকে — "সেখানেই অমরনাথ আমায় ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না। তোমার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফল ফলিতেই হইবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের উক্ত অলৌকিক দর্শন ও অভিজ্ঞতার কেন্দ্রভূমি ছিল অমৃতময় শৈবতীর্থ অমরনাথ।

অমরনাথ যে অমরত্বদায়ী বা মহামোক্ষদায়ী তীর্থভূমি, তার আখ্যান পাওয়া যায় শিবোক্ত অমরপুরাণে।

দেবর্ষি নারদের পরামর্শে দেবী পার্বতীর ইচ্ছা হল অমরত্ব লাভের। নারদের মুখেই শুনেছেন দেবাদিদেব মহেশ্বরের শ্রীমুখ থেকে সৃষ্টি রহস্যের মূল কাহিনী যদি কেউ শোনে, তাহলে সে অমর হয়ে যাবে। দেবী পার্বতী ধরে বসলেন পতিদেব শঙ্করকে।

ত্রিপুরারি ইতস্তত করেও শেষে রাজি হলেন। সমস্যা হল কোথায় শোনাবেন এ কাহিনী। যে শুনবে সেই-ই তো অমর হয়ে যাবে। প্রয়োজন অতি নিরালা স্থান। অবশেষে ধূর্জটি মানস নেত্রে ভেসে উঠল হিমালয়ের অতি দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে একটি বিজন গুহা। এই গুহাই বিশ্ব বিশ্রুত অমরনাথ গুহা।

পিনাক পাণির শর্ত ছিল কাহিনী চলাকালীন দেবী জেগে থাকার সঙ্কেতস্বরূপ 'হুঁ হুঁ' শব্দ করে যাবেন। নিদ্রা যেতে পারবেন না।

কাহিনী শুরু করলেন পঞ্চানন। দেবী গৌরী শুনছেন স্তব্ধ বিস্ময়ে। মাঝে মাঝে হুঁ হুঁ শব্দও করছেন। কিন্তু একসময় নিজের অজান্তে নিদ্রাগত হলেন।

চোখ বুজে একাগ্রভাবে বলে চলেছেন অমরকথা অমরনাথ। হুঁ হুঁ শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। হঠাৎ কি মনে করে থামলেন তিনি। দেখলেন দেবী নিদ্রাগতা। বিস্মিত, কে তাহলে এতক্ষণ কাহিনীকে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। রুষ্ট, কুপিত, ত্রিপুরারি যোগবলে দেখলেন গুহার এক কোণে রয়েছে একটি শুকপাখী। ক্রুদ্ধ শূলপানি ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে গেলেন শুকের দিকে। প্রাণ ভয়ে উড়ে চলল শুক। কিন্তু মহাকালের কবল থেকে রক্ষা করবে কে?

এই শুক ছিল বৈকুণ্ঠবাসী। সেখানে শ্রী বিষ্ণুর দর্শন না পেয়ে সে যাচ্ছিল মর্ত্যে তাঁরই অবতার রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে। পথমধ্যে শ্রান্ত হয়ে গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে শোনে হরগৌরীর বার্তালাপ। পার্বতীর শর্ত রাখতেই সে শব্দ করে যায়।

এদিকে প্রাণভয়ে শুক উড়তে উড়তে আসে বদরিকাশ্রমে। সরস্বতী নদীতীরে বেদব্যাসের আশ্রমে। ব্যাস পত্নী তখন স্নানান্তে সূর্য প্রণামে। প্রণাম শেষে তিনি হাই তুলতেই ভীত শুক সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করে ব্যাস জায়ার শরীরে। প্রমাদ গুণলেন আশুতোষ। শুকের বুদ্ধি দেখে প্রসন্ন হলেন। শান্ত এখন তিনি। আশীর্বাদ দিলেন ব্যাসপত্নী বাটিকাদেবীকে — তোমার শরীরে প্রবিষ্ট শুক এক শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী পুত্ররূপে জন্ম নেবে। জগতের মানুষকে অখিল শাস্ত্রের রসস্বরূপ ভাগবতের রসাস্বাদন করাবে। আর যে গুহায় বসে সে আমার অমর কথা শুনেছে, তা হবে অমৃতপ্রদায়ী মহাতীর্থ। সেখানে ভক্তদের মহামোক্ষ দানের জন্য সদা বিরাজমান থাকব। বলা বাহুল্য শুকই পরবর্তীকালে ব্যাসপুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেব রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাশ্মীর হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে হিমাচ্ছাদিত শৈলশিখরে অমরনাথ গুহাতীর্থের স্থান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৪১৭৫ মিটার। শ্রীনগর হতে ১৪২ কিমি। গুহা সংলগ্ন পর্বতের নাম অমরনাথ পর্বত। উত্তর পশ্চিমমুখী এই গুহার আয়তন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় যথাক্রমে ৪২.৭২ মি, ৪২.৭২ মি, ২৭.৪৩ মি।

বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী ও ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যে বলা হয়ে থাকে অমরনাথ তুষারতীর্থের আবিষ্কর্তা নাকি গুজ্জর সম্প্রদায়ভুক্ত মেষপালক আক্রম বাট। তার আগে তীর্থের খবর অজ্ঞাত ছিল। তা সঠিক নয়।

১১৫০ সালে রচিত কলহনের রাজতরঙ্গিনী, যা আদপে কাশ্মীর রাজবংশের ইতিহাস, সেখানে বলা হয়েছে অমরনাথের কথা। ৭৮৪৪ শ্লোকে নিবদ্ধ এই ইতিহাস গ্রন্থে বলা আছে রাজা রামদেব অত্যাচারী দুশ্চরিত্র রাজা শুকদেবকে বন্দী করেন এবং অমরনাথ পর্বতের নিকটবর্তী লম্বোদরী (বর্তমান লিডার) নদীতে ডুবিয়ে মারেন খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে। সেখানে দ্বিতীয় তরঙ্গে বলা হয়েছে রাজা সমদিমত (৩৪-১৭ খৃঃপূঃ) বন মধ্যে একটি তুষারলিঙ্গের অর্চনা করতেন। ২৬৭ সংখ্যায় শ্লোকে বলা হয়েছে তীর্থযাত্রীরা অমরেশ্বর যাওয়ার পথে শুশ্রমনাগ (শেষনাগ) দেখতে পেয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অমরনাথ আজ থেকে ৩০০০ বছর আগে অমরেশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন।

কথিত আছে মহর্ষি ভৃগু প্রথম তুষারলিঙ্গ দর্শন করেন। তারপর মহর্ষি মার্কন্ডেয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে এই লিঙ্গ দর্শন করেন শঙ্করাচার্য।

অমরনাথ গুহায় ২৫ গজ সোজা যাওয়ার পর ডাইনে গজ-আষ্টেক এগিয়ে শেষ প্রান্তে দর্শন হয় ঈষৎ নীল সুকঠিন বরফের স্ফটিক সদৃশ স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ। গুহার ছাদের অজ্ঞাত স্থান থেকে বিন্দু বিন্দু ঝরছে চুন (স্ট্যালাগমাইট) মিশ্রিত জলবিন্দু। চুনের কারণেই লিঙ্গ শক্তপোক্ত আকার ধারণ করে।

প্রতি মাসে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে লিঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমায় ৮ ফুট যার আকার, অমাবস্যায় তার চিহ্ন থাকে না। গুহায় এক কোণে দেখা যায় দুটি বরফের ছোট স্তূপ। বলা হয় একটি পার্বতী আর অন্যটি গণেশ।

২০০৭ সালে তুষারলিঙ্গের বিপর্যয় দেখা যায়। ১২ মে (২০০৭) যে লিঙ্গ ছিল উচ্চতায় ১২ ফুট, জুনে হয় তা ৮ ফুট আর ১ জুলাই তা গলে ১ ফুট অবশিষ্ট থাকে। বিজ্ঞানীরা এর জন্য দায়ী করছেন বিশ্ব উষ্ণায়ণকে। আর সাধুসন্ত, ভক্তরা বলছেন পাপের ফল। অমরনাথ দর্শনের শাস্ত্র নির্দিষ্ট সময়কাল হল সূর্য যখন সিংহরাশিতে ও চন্দ্র থাকে কুম্ভে অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমার সময়। অবশ্য এখন যাত্রা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে চলে ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত। তবে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দর্শন মাহাত্ম্য অনেক বেশি। এর পথিকৃৎ মহর্ষি ভৃগু বলেছিলেন, শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে অমরনাথের

(এরপর ১২ পাতায়)

রক্তাক্ত রাখীবন্ধন

বৈদেহীনন্দন রায় ।। শ্রাবণ মাস ধর্মকৃত্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত উপযোগী মাস। এই মাসে সনাতন হিন্দু বলয়ে পালিত হয় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ভারতবাসী মাসটিকে ভগবান শিবের আবির্ভাব মাস হিসেবে মানায় সমস্ত শিবমন্দিরে শুরু হয় জলাভিষেক যাত্রা। উত্তর ভারতীয় চলতি ভাষায় কাঁরবা যাত্রা। বাংলায় যা বাঁক যাত্রা বা বাঁকে জল নিয়ে শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে চলা।

কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারী এ দৃশ্য বিরল নয়। শ্রাবণ মাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হল তীজ। বাংলায় যার পরিচয় ঝুলন। মূলত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান হলেও ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো। তবে শ্রাবণ মাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অতিব্যাপক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল রক্ষাবন্ধন বা রাখীবন্ধন। যা বর্তমানে সার্বজনীন সামাজিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত।

রাখীবন্ধনের শুরু কবে — এ নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয় ভগবান কৃষ্ণের ঝুলন লীলায় আনন্দ উচ্ছ্বসিত শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন গোপীরা নন্দনন্দনের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। আর এক সূত্র বলে, দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদের পরাক্রমে দেবতারা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। দেবরাজ ইন্দ্র এ বিষয়ে গুরু বৃহস্পতির উপদেশ প্রার্থনা করেন। কিন্তু বৃহস্পতি তার মত পোষণের আগেই শচীদেবী বলেন, তিনি এর সমাধান জানেন। পরদিন শ্রাবণী পূর্ণিমা। ইন্দ্রানী সেইদিন দেবরাজের হাতে একটি মন্ত্রপূত ডুরি বেঁধে দেন। আর সেই ডুরি বা তাবিজের বলে দেবতারা পরাস্ত করেন অসুরদের।

রাখী বন্ধনের চল বঙ্গজীবনে সাম্প্রতিক বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত-এর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় না। কিন্তু উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এর প্রভাব কিংবদন্তির পর্যায়ে। রাজস্থানে এই অনুষ্ঠান দ্বাদশ শতক থেকেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। পূর্বতন রাজপুতানায় বহু নারী এই রাখীকে মর্যাদা রক্ষার বর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে মেবারের রাণী কর্ণাবতী বাদশা হুমায়ুনকে রাখি বন্ধনের কাহিনী তো বহুশ্রুত। গুজরাটের বাদশা বাহাদুর শাহের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষার জন্য কর্ণাবতী রাখীর মাধ্যমে বাদশা হুমায়ুনকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আবার দেখা যায় সপ্তদশ শতকে মেবারের মহারানা রাজসিংহ রূপনগরের রাজকুমারী প্রদত্ত রাখীর মর্যাদা রাখতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধ করতে ইতঃস্তত করেননি। রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে যে রাখী তৈরি হয় সিল্কের সুতো, জরি বা স্বর্ণ-আভরণ দিয়ে, উত্তরাখন্ডে কুমায়ুনের অন্তর্গত চম্পাবত জেলার দেবীধূরায় উক্ত রাখীর প্রচলন দেখা যায় না। সে রাখী উৎসব হয় রক্তের হোলিতে।

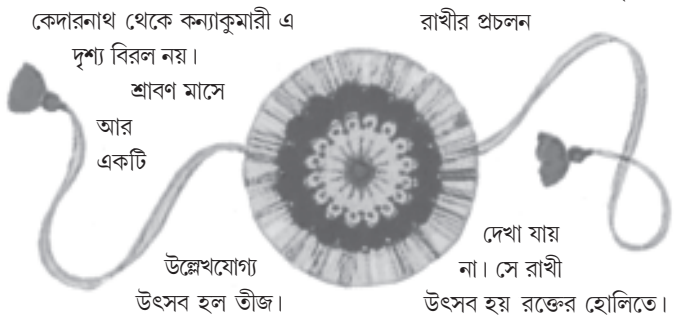

দেবীধূরার এই রাখি উৎসবটি সত্যিই বিচিত্র। উৎসবের রীতি হল পাথর যুদ্ধ বা বাগওয়াল। যুদ্ধের প্রাঙ্গণ বারহী দেবী মন্দির। বারহী দেবী হলেন দুর্গার আর এক রূপ। যুদ্ধ হয় যুযুধান দুই ভক্তদলের মধ্যে। উভয় পক্ষ যুদ্ধ করে পাথর ছুঁড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই পাথরযুদ্ধে মারাত্মক রক্তপাত হয়। কিন্তু ভক্তদের তখন এতই উন্মত্ত অবস্থা যে রক্তপাত সত্ত্বেও থামে না। থামে একমাত্র মন্দিরের পুরোহিতের কথায়। যখন তিনি বলেন বলিদান সঠিক হয়েছে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রধান পুরোহিতের নিকটস্থ সারদা নদীতে স্নানের পর। অবশ্য বাগওয়ালে অংশগ্রহণকারীরাও স্নানে অংশ নেন। এরপর অন্য পুরোহিতরা প্রধান পুরোহিতকে সামনে রেখে দেবীকে স্নান করান। চোখ বাঁধা অবস্থায়। কারণ দেবীর অর্ধনগ্ন দেহ দেখা রীতিবিরুদ্ধ। স্নানের পর বিগ্রহকে পোষাক পরানোর পর তারা চোখ খোলেন। এবার দেবীকে রাখা হয় একটি ধাতুর সিংহাসনে। পূজা চলে সকাল ৬টা থেকে ১১টা।

এরপর বলিদান অর্থাৎ বাগওয়াল বা পাথর মারামারি। পাথর যুদ্ধে দেখা যায় অংশগ্রহণকারী কোনও ভক্ত মারাত্মক জখম হয়েছে। তাকে হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া উপায় থাকে না। শ্রাবণী পূর্ণিমায় এই রাখী পর্বটি যতই ভয়ানক বিপদ্‌জনক হোক প্রশাসন একে থামানোর কোনও চেষ্টাও আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। জনগণ বিরুদ্ধ হবে বা ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ হবে ভেবে।

আর্ট অফ লিভিং

ইন্দিরা রায়

সমাজ সেবা এক মহৎ কাজ। আজকের দিনে মানুষ হয়ে পড়ছে স্বার্থকেন্দ্রিক। মহানুভবতা, মানবিকতা অথবা নিজের বৃত্তের বাইরে অন্যের কথা ভাবা এখন প্রায় অভিধানের বন্ধ শব্দের মতো। কিন্তু এরই মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নীরবে পেছনে থেকে সমাজসেবামূলক কাজ করে যান মনের আনন্দে কোনও প্রতিদানের আশা না রেখে। এমনই এক মহিলা ভারতী গাঙ্গুলি।

বাড়ীর পরিবেশেই আছে সমাজসেবার মানসিকতা। সুতরাং একই পরিবারে একই মানসিকতা থাকায় ভারতী গাঙ্গুলি সেই

কাজের পুরোধা। বছর পনেরো আগে গাঙ্গুলি পরিবারের পক্ষ থেকে ভারতীদেবীর শাশুড়িমা'র স্মৃতিতে খোলা হয় সুষমা দাতব্য চিকিৎসালয়। ট্রাস্টও গড়ে উঠেছে পরিবারের সদস্য নিয়ে। তার মধ্যে মূল দায়িত্ব পালন করেন ভারতী গাঙ্গুলি ও তাঁর স্বামী সত্যব্রত গাঙ্গুলি। সুষমা দাতব্য চিকিৎসালয়-এ প্রধানত সেবামূলক কাজ হলো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। ডাঃ নায়েক বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। এ সম্পর্কে ভারতী দেবী জানালেন — সেবামূলক কাজ কলকাতায় দুটি জায়গায় হয় — দক্ষিণে শকুন্তলা পার্ক ও গড়িয়াতে। যারা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে, তাঁদের কাছ থেকে মাত্র দু'টাকা নেওয়া হয় এবং তার বিনিময়ে সব রকম চিকিৎসা পাওয়া যায়। কোনও জটিলতা দেখা দিলে বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়। দু'জায়গায় ডাক্তারবাবু সপ্তাহে তিনদিন করে বসেন। শুধু চিকিৎসা নয়, গড়িয়া কেন্দ্রে দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের হাতের কাজ, সেলাই শেখানো হয়। সেইসঙ্গে ওখানে পথশিশুদের প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা করানো হয়।

কিন্তু শুধুমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়, অসহায় মহিলাদের সেলাই শেখানো আর পথশিশুদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে ভারতী গাঙ্গুলির সমাজ সেবামূলক কাজ সীমাবদ্ধ নয়। উনি বর্তমানে 'আর্ট অব্ লিভিং' -এর ওপর বিভিন্ন কাজ করছেন। 'আর্ট অব লিভিং' অর্থাৎ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে শান্তি ও আনন্দ লাভের এক বিশেষ
পদ্ধতি।

এই চিন্তাভাবনা কী আপনার নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত? না না, কখনই নয়। সাধক শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর-এর। প্রায় কুড়ি বছর আগে, ওনার সান্নিধ্যে আসি। জীবনে শান্তি ও আনন্দলাভের জন্য ওনার প্রবর্তিত পদ্ধতি 'আর্ট অব্ লিভিং'-এর কোর্স করি। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য — যোগ-ধ্যান-প্রাণায়ামের মাধ্যমে আনন্দ ও শান্তি লাভ। ছ'দিনের কোর্সে প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন ঘন্টা। শুধু এটাই নয়, আরও অনেক পদ্ধতি আছে।

আর্ট অব্ লিভিং-এর মাধ্যমে ড্রাগ আসক্তদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের মনস্তত্ত্ববিদ্ ও কাউন্সেলারদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। সেই সঙ্গে প্রাণায়াম, ধ্যানও করানো হয়। এছাড়া সেবামূলক কাজ হয়। এখন সুন্দরবনে কাজ চলছে। গত বছরও মেদিনীপুরে বন্যার সময়ে সাহায্য করা হয়েছিল। এ বছরও আয়লায় দুর্গতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর্ট অব্ লিভিং-এর পক্ষে ভারতী দেবী আরও জানালেন, বনগাঁ, বাইপাসের কাছে গড়চা বস্তিতে স্কুল চালানো হয়। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ানো হয়, তার পাশাপাশি কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস শেখানো হয়। ইতিমধ্যে

আর্ট অফ লিভিং-এর ট্রেনিং ক্লাস।

ছোট ছেলেদের জন্য হোমও তৈরি হয়েছে। হোমে যারা থাকে তাদের জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব। পাঁচ বছর হল এই হোম 'রূপায়ণ' গড়ে উঠেছে।

'রূপায়ণ'-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টরই শুধু নয়, আর্ট অব্ লিভিং'-এর মাধ্যমে ড্রাগ অ্যাডিক্টদের ছেলে-মেয়ে উভয়কেই মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন স্বয়ং ভারতী গাঙ্গুলি। তিনি এ কাজেরও প্রজেক্ট ডিরেক্টর। কোন পথে কীভাবে মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো যায় জানতে আগ্রহী হলে তাঁর জবাব ঃ এই সব আসক্তদের মনস্তত্ত্ববিদ ও কাউনসেলার দ্বারা চিকিৎসা করানো তো হয়ই, তারপর ধ্যান যোগ শেখানো হয়। ছেলেদের শুধু নয়, মেয়েদেরও স্বাভাবিক করা হয় একই ভাবে। এই প্রজেক্ট তিনমাস পর্যন্ত রেখে চিকিৎসা করানো হয়। স্বাভাবিক হলে বাড়ি ফিরে যায়। দশজন মেয়ের জন্য তিন চারজন শিক্ষিকা থাকেন। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এটাই যে, যেসব মহিলারা ড্রাগ অ্যাডিকশন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, তারাই ট্রেনিং দেন। এ সব ট্রেনিং নেওয়া ও থাকবার খরচ রোগীরা দিয়ে থাকে।

আর্ট অব লিভিং-এর পক্ষে মহিলাদের জন্য আরও প্রকল্প আছে। ঘি, মশলা তৈরি, হাতের কাজ ইত্যাদি। এদের মূলধন সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। ওদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রিরও ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পের কাজ সব জেলাতেই হচ্ছে। কোর্স করছে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ। এছাড়া আছে ফাইভ-এইচ প্রোগ্রাম। এর মধ্যে পাঁচটা এইচ হল — হেলথ্, হাইজিন, হিউম্যান ভ্যালু, হাউজিং, হারমনি ইন ডাইভার্সিটি। গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করার জন্য ইয়ুথ লিডারশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এছাড়া আছে জিরো বাজেট ফার্মিং — একটা গোরু দিয়ে একশো একর জমি চাষ করা শেখানো হয়। শুধু গোবর ও গোচোনা দিয়ে চাষ করার কোর্স দশ দিনের। এইসব প্রকল্পে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আছে অভিজ্ঞ টিচার। টিচাররা শিক্ষাকতার ট্রেনিং নিয়ে আসে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে।

ভারতী দেবী প্রজেক্ট ইনচার্জ হিসেবে বিভিন্নভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এরই মধ্যে পাঁচ/ছ ঘন্টা সময় আর্ট অব্ লিভিং-এর কাজে ব্যস্ত থাকেন।

এত বিশাল কর্মযজ্ঞ করার অর্থ কিভাবে আসে প্রশ্নের উত্তরে ভারতী দেবী জানালেন, — এসব কোর্সের জন্য ডোনেশন নেওয়া হয়। ডোনেশনের হার কমপক্ষে ৩০০ টাকা। এই হার এলাকা অনুযায়ী বাড়ে কমে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তাঁর সপ্রতিভ জবাব — ভবিষ্যতে মেয়েদের স্বনির্ভর করা, হোম তৈরি করার পরিকল্পনা আছে। এসব কাজ সব রাজ্যে চলছে। আমাকে এখন এই কাজের জন্য বাংলার বাইরে যেতে হয় — বিহার, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, নর্থ ইস্ট-এ। ওখানকার স্থানীয় মানুষের মধ্যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এসব কাজ করার মধ্যে আছে এক আনন্দ। এ পথে আনন্দ ও শান্তি পেতে যোগাযোগ করুন—

পুষ্পাঞ্জলি বিল্ডিং
৬০, মহানির্বাণ রোড, কোল-২৯
ফোন : ২৪৫৩ ১০১৮

অমরনাথের অমরালয়ে

(১১ পাতার পর)

দেবদন্ড (ছড়ি) সামনে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। পূর্ণিমার দিন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দর্শনে হবে মোক্ষলাভ। আর এই তীর্থের নাম হবে অমরনাথ। অন্যমতে মহর্ষি মার্কন্ডেয় এই যাত্রার প্রবর্তক।

অমরনাথের ছড়িযাত্রা শুরু হয় প্রথানুসারে শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চ মীতে, শ্রীনগর থেকে। থাকে রূপোর পাতে মোড়া মুষলাকৃতি দুটি দন্ড ও অমরনাথের বিশাল ত্রিশূল। ছড়ির পর রাজচ্ছত্র। তারপর পুরোহিতরা। যাত্রার পুরোভাগে থাকেন সাধুসন্তরা।

শ্রীনগর থেকে শোভাযাত্রা নামপুর, অবন্তীপুর, আইসমোকাম হয়ে থামে পহেলগাঁওতে। সেখান থেকে দ্বাদশীর দিন যাত্রা করে চন্দনবাড়ি, পিশুটপ, শেষনাগ, মহাগুণাপাস, পঞ্চ তরণী হয়ে অমরনাথ পর্বতের পাদচুম্বিত অমরগঙ্গায় পূণ্যস্নানের পর শোভা যাত্রা পৌঁছায় অমরনাথ গুহায়। শ্রাবণী পূর্ণিমায়।

অমরনাথ যাত্রীরা তিনমাস উক্তপথেই যাত্রা করেন। চন্দবাড়ির, শেষনাগের পথই চিরকালের পথ। বর্তমানে রাজ্য সরকার নতুন পথ শ্রীনগর লেহ হাইওয়ের কাছে বালতাল থেকে একটি সংক্ষিপ্ত পথ বার করেছে। সে পথও ব্যবহার করছেন অনেকে। পহেলগাঁও হতে অমরনাথে পৌঁছানোর ৫৪ কিমি দুর্গম পথ অতিক্রম করে যাত্রীরা যখন গুহাতীর্থে পৌঁছান, পথের শ্রান্তি ভুলে তাঁরা অধীর আগ্রহে নবশক্তিতে পূর্ণ হয়ে অপেক্ষা করেন কখন আসবে সেক্ষণ। যাঁকে দুচোখ ভরে দর্শন করে জাগবে অমৃতত্বের অনুরণন।

বড়ি শিল্প নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় নৈহাটির বড়িগ্রামের মহিলারা

পায়েল বাগচী : নদীয়া।। "যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন' — এই জনপ্রবাদ যে চিরসত্য, তার প্রমাণ মিলল নৈহাটীর আম্রপল্লী এলাকায়। এখানে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে প্রায় ৩০০ মহিলা বড়ি শিল্প আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। তাই আম্রপল্লীর নাম ধীরে ধীরে বড়ি-গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামের গৃহবধূ অর্চনা রায়, নিভা মন্ডল, শান্তি মজুমদারেরা ভোরের কাক ডাকার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে প্রতিদিন। সংসারের কাজ সেরে সকাল-সকাল নেমে পড়েন বড়ি তৈরিতে। মটর, মুগ, মুসুর ডালের বড়ি তৈরি হয়। কোনটার রঙ সাদা, কোনটা হলুদ বা কোনটার রঙ কমলা। অর্চনা, নিভা দেবীদের স্বামীরা অবশ্য কেউ দিনমজুর আবার কেউ মাছের চারা তৈরির পেশায় যুক্ত। অর্চনা দেবী জানান, খাটুনির যথার্থ মজুরি মেলে না। মেশিনে ডাল-চাল গুঁড়ো করে এনে সকাল সকাল বড়ি দিয়ে রৌদ্রে শুকোতে দিতে হয়। অনেকক্ষণ ধরে জল দিয়ে ফেটাতে হয়। পাইকারি ব্যবসায়ীরা প্রতি কেজিতে মাত্র ৩২ টাকা দেন। ডালের দাম বেড়ে যাওয়ায় লাভ তেমন হচ্ছে না। অপর কর্মী নিভা দেবী জানান, এখানকার বড়ি কলকাতার বড়বাজার ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছায়, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমানে। হাওড়া জেলায়ও এখানকার বড়ির চাহিদা রয়েছে। সরকার একটু মুখ তুলে তাকালে আরও চাঙ্গা হতে পারে নৈহাটির এই অতি প্রাচীন শিল্প। তারা জানিয়েছেন কখনও কখনও বাজার মন্দা যায় শিল্পীদের। প্রতি বর্ষাতেই বড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তখন কম দামে বড়ি বিক্রি করতে হয়। তবুও "কুছ পরোয়া নেহি" অর্চনা-নিভা-শান্তি দেবীদের। ভগবানের কাছে তাদের একটাই প্রার্থনা — "আমাদের সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

রক্ষাবন্ধন হোক বিশ্ব ভাই-বোন দিবস

ইন্দ্রেশ কুমার

বেশ কয়েক হাজার বছর আগেই আমাদের দেশের ঋষিরা বিভিন্ন উপাসনা, জাতপাত, ভাষা ও আঞ্চলিকতার মধ্যে যে বিবাদ-বৈষম্য, উত্তেজনা ও বিদ্বেষ রয়েছে, তার প্রতিরোধে এক সামাজিক মূল্যবোধভিত্তিক ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ বিশ্ব এক পরিবার হল সেই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মূল স্বরূপটি জানা প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তা যখন আপন সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখতে ইচ্ছা করলেন, তখন সমগ্র মানব সমাজের কাছে এক বার্তা প্রকাশিত হল — বিবিধতার মধ্যে একতা অর্থাৎ একাত্মতা বিদ্যমান। আমরা সবাই যখন এক পরমপিতার সন্তান, তাই বিশ্বের সবাই আমরা একই পরিবারে অঙ্গ অর্থাৎ আত্মীয়।

এই একাত্মতার ভাবনাকে সমাজ জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য আমাদের ঋষি-মুনি তথা সমাজ চিন্তাবিদরা বিভিন্ন মেলা উৎসব পূজা-পার্বন প্রভৃতির আয়োজন করলেন যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। সত্যযুগের একটি কাহিনীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন রাজা বলি অহংকারের বশবর্তী হয়ে শুধু এই বিশ্বের নয়, ত্রিভুবনেরই সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেন, তখন ভগবান বামন অবতার হিসেবে তার কাছে উপস্থিত হয়ে মাত্র তিন পা ভূমি চাইলেন। বামনরূপী ভগবান তাঁর পা দিয়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ডকেই ঢেকে ফেললেন। রাজা বলির কাছে দান করার মতো কণামাত্র জমিও রইলো না। তখন রাজা বলি বুঝতে পারলেন, এই বামনরূপী ভিক্ষার্থী সাক্ষাৎ ভগবান — স্বয়ং বিষ্ণু। বলি তখন ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং প্রার্থনা করলেন, ভগবান যেন তাকে ও তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করেন। কিছু দিন যাওয়ার পর মা লক্ষ্মীর মনে হল, ভগবান অবতার হিসেবে কাজ শেষ করার পরও কেন ফিরে আসছেন না। মা লক্ষ্মী তখন ধ্যান-নেত্রে জানতে পারলেন ভগবান বিষ্ণু রাজা বলিকে রক্ষার কাজে ব্যস্ত। তিনি তখন বালিকার বেশে রাজা বলির দরবারে উপস্থিত হলেন। রাজা বলি তাকে কিছু প্রার্থনা করতে বললে বালিকা রূপা লক্ষ্মী রাজা বলির রক্ষাকারী বামনরূপী ভগবানকেই প্রার্থনা করলেন। রাজা বলির বুঝতে অসুবিধে হল না যে এই বালিকা জগৎ জননী লক্ষ্মী। বলি তখন বললেন, মা, তাহলে আমাকে কে রক্ষা করবে? বালিকা তখন নিজের লজ্জা বস্ত্র থেকে একটু সূত্র নিয়ে বলির হাতে বেঁধে দিয়ে বললেন, এই সূত্র রক্ষাসূত্র হিসেবে তোমাকে রক্ষা করবে। সেই তখন থেকে রক্ষাবন্ধন পরম্পরার শুরু। তাই আজও

বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা এই ঘটনার কথা স্মরণ করে একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন —

যেন বদ্ধো বলী রাজা,
দানবেন্দ্র মহাবলঃ।
তেন ত্বাং অনুবন্ধামি,
রক্ষে মাচল, মাচলঃ।

সত্য এবং দ্বাপর যুগে আরও একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল। একবার স্বর্গের রাজা ইন্দ্র অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় আদি সাংবাদিক নারদ মুনি ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর কাছে গিয়ে জানালেন, এইবারের যুদ্ধে আপনার স্বামীর জয়লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। শচীদেবী তখন নিজের লজ্জাবস্ত্র থেকে সুতো তৈরি করে তা স্বামীর হাতে বেঁধে দিলেন। এই রক্ষাসূত্রর প্রভাবে যুদ্ধে ইন্দ্র জয়লাভ করতে সমর্থ হলেন। তখন থেকে আবার রক্ষাবন্ধনের পরম্পরা সমাজে আরও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হতে লাগল।

দ্বাপর ও ত্রেতা যুগে এই পরম্পরার একটি নবরূপায়ণ লক্ষ্য করি। গুরু-শিষ্য পরম্পরার মতো শ্রমিক মালিকের সাত্ত্বিক ও নৈতিক সম্বন্ধ। শিষ্য রক্ষাসূত্র নিয়ে গুরুকে প্রণাম করে, গুরু তাকে জ্ঞান প্রদানের আশ্বাস দেয়। শিষ্যও গুরুকে সেবা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। তেমনই শ্রমিক মালিকের কাছে রক্ষা সূত্র নিয়ে যায়। মালিক শ্রমিককে রোজগারের গ্যারেন্টি দেয়। অন্যদিকে শ্রমিক মালিককে সম্মান ও অনুশাসন পালনের সংকল্প জানায়।

ইতিহাসের দিশা বদলায়। রক্ষাবন্ধন উৎসবের সঙ্গে নতুন নতুন কাহিনী ও পরম্পরা যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু কলিযুগে এই আনন্দময় ও পবিত্র পরম্পরার সামনে এক প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আজ সাম্রাজ্যবাদী ও ভোগবাদী প্রবৃত্তি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। যে নারী সম্পর্কে সেই সময়ে বলা হতো — নারীই সংস্কৃতি, সংস্কৃতিই নারী। ঈশ্বরের পর এই পৃথিবীতে যদি কিছু সত্য থাকে তবে জন্মদাত্রী, ধাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী তো মা-ই। মা-এর চরণই তো স্বর্গ। বলা হয়েছে — "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'। অথচ আজ নারী ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে চরিত্র ও মর্যাদা রক্ষার জন্য নারী সমাজ রক্ষাবন্ধনের এক নতুন দিক নির্দেশ করেছে। নারী এই রক্ষা সূত্র নিয়ে এগিয়ে যায় এবং নিজেদের পবিত্র চরিত্র মাধুর্যে ওই রক্ষাসূত্র পুরুষের হাতে বেঁধে দেয় এবং এর ফলে এক নতুন সম্পর্ক — ভাই বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ভাই-বোনের সম্বন্ধ ঈশ্বরের দান। এই সম্পর্ককে একই মায়ের সন্তান হিসেবে দেখা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে চিকাগো বিশ্ব ধর্মসভায় ভাই ও বোন বলে যখন সম্বোধন করেন তখন পুরো সভাস্থল করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে রক্ষাবন্ধন ভাই- বোন-এর উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কোথাও রাণী দুর্গাবতী (কর্ণাবতী) হুমায়ুনের কাহিনী, কোথাও এক পীড়িত নারী ও হরিসিং নলওয়ার কাহিনী এই প্রসঙ্গে প্রচলিত রয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে হিমালয় পরিবার নামে আন্দোলন এই রক্ষাবন্ধন উৎসবকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। সমাজ পরিবেশ বন্ধু হোক — এটাই হল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। একথা মনে রেখেই শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষ একটি বৃক্ষতে রক্ষাসূত্র বাঁধে এবং সংকল্প গ্রহণ করে যে এই বৃক্ষকে সে কাটতে ও মরতে দেবে না। বৃক্ষটির যত্ন নেবে। রক্ষা করবে।

রক্ষাবন্ধন উৎসব কোনও জাতি বিশেষের ধার্মিক পরম্পরা নয়। জাতি ভাষা পন্থ আঞ্চলিকতার ঊর্ধে উঠে পবিত্রতা ও আনন্দে ভরপুর জীবনমূল্য রক্ষাকারী এক পরম্পরাগত উৎসব। বর্তমান বিশ্ব হিংসা উত্তেজনা, দূষণ, অপরাধ, অনৈতিকতায় ভরে গেছে। এই সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য রক্ষাবন্ধন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। আজ বিশ্বে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

সমগ্র বিশ্বে রক্ষাবন্ধনের দিনটিকে আমরা তাই 'বোন-ভাই' দিবস হিসাবে পালন করতে পারি। সারা বিশ্বে মৈত্রী ও শান্তির বার্তা ঘোষণা করতে পারি। বোন ভাইকে, নারী পুরুষকে রক্ষাসূত্র বেঁধে দিয়ে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করি — আমরা সব এক মানব-পরিবারের অঙ্গ।

।। রখীবন্ধন উপলক্ষে প্রকাশিত।।

আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ

(৮ পাতার পর)

স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় 'বর্তমান' পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক পবিত্রকুমার ঘোষের উদ্দেশ্যে তাঁর লিখিত পত্রে। পবিত্রবাবুর লেখা 'যাদের হত্যা করা হয়েছে' এই শিরোনামে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই নিবন্ধ পড়ে তিনি এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে, তাঁর আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি পবিত্রবাবুকে লিখছেন — 'আমি ভাবিতে পরিতেছি না ১৯০০ দেশপ্রেমিক সৈনিক যারা নেতাজীর মত আদর্শ পুরুষের আশ্রয় নিয়া দেশের জন্য প্রাণপাত করার ব্রত নিয়েছিল তাদের অন্ধকার ঘরে গুলি করিয়া মেরে ফেলার জঘন্য কর্ম পৃথিবীর কোন শাস্ত্রে আছে? এত হীনতা বৃটিশ শক্তির? বৃটিশ শক্তির এই জঘন্য ও হীনতম কার্যের সংবাদ পৃথিবীর সব সংবাদপত্রে জানাইয়া দিন। লন্ডনের লোকেরা পড়ুক। আমেরিকার লোকেরা পড়ুক। ফরাসীর লোকেরা পড়ুক। চিন্তাশীল জগতের লোকদের বৃটিশ শক্তির এই জঘন্যতম কর্মের কথা জানাইয়া দিন। যে ৬০০ সৈন্য আগে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের কি হইল? আর ১৩০০ সৈন্যকে বিনা বিচারে রাতের অন্ধকারে চার দেওয়ালের মধ্যে যে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল তার বিচার কি হইবে? এই বিষয়টি নিয়া আপনি সারা দেশব্যাপী সারা বিশ্বব্যাপী তোলপাড় করুন। এই হৃদয়বিদারক সংবাদে আমি একপ্রকার শয্যাশায়ী। আহার নিদ্রা করিতে পারিতেছি না। কাহাকেও ভয় করিবেন না। বেদনাজর্জরিত মহানামব্রত।' পত্রটি পেয়ে শ্রীঘোষ অভিভূত হলেন ও ২/৩ দিনের মধ্যে বর্তমান পত্রিকায় পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এইভাবে এই পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজীর জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক্ প্রকাশিত হয়ে তাঁর হৃদয়বত্তার সহিত স্বদেশ ও বিশ্বপ্রেমের দিকটি আরও প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। পত্রাবলীর বর্তমান সংকলনটির ভূমিকা লিখেছেন পরমভাগবত বৈষ্ণব শিরোমণি প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিনোদকিশোর গোস্বামী, যা এককথায় অতুলনীয়। আধ্যাত্মিক জীবন-চেতনার উন্মেষে মানবজীবনের ক্ষেত্রে এই পত্রাবলীর বহুল প্রচার একান্ত কাম্য। ২৬৮ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য ৮০ টাকা।

শ্রীমহানামব্রত পত্রাবলী (১ম খন্ড) : — শ্রীমহানামব্রত জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন পরিষৎ, শ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর (বাগুইআটি), ভি আই পি রোড, কলকাতা-৭০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। পরিবেশক — শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর।

সমাবেশ সমাচার

সিউড়ীতে সংস্কার ভারতীর নটরাজ পূজা

সংস্কার ভারতী-সিউড়ি শাখা আয়োজিত নটরাজ পূজন উৎসব গত ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত হল। ১১ জুলাই সিউড়ি ইরিগেশন ক্লাবের সভাকক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নটরাজ বন্দনা তথা গুরু পূর্ণিমা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পী তথা বংশীবাদক অসীমকান্তি মজুমদারকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। শাখার সভানেত্রী লোকসম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী বিশিষ্ট শিল্পীকে সম্মান জ্ঞাপন করে উত্তরীয়, মানপত্র, পুষ্পস্তবক, মিষ্টান্নসহ বিবিধ উপাচার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রণবানন্দ ঠাকুর, সংস্থার প্রাদেশিক সহ-সভাপতি সোমেশ্বর বড়াল, উপদেষ্টা যদুপতি দত্ত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে নটরাজ এর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি প্রণবানন্দ ঠাকুর বলেন, সংস্কার ভারতীর এই প্রচেষ্টা অভিনব।

প্রত্যুত্তরে অসীমকান্তি মজুমদার বলেন, সংস্কার ভারতীর কাজ আর ব্যাপক আকারে প্রসারিত হোক — পরম মঙ্গলময়ের কাছে এই প্রার্থনা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে সংস্থার সদস্য সদস্যারা আবৃত্তি, একক নৃত্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পী অসীমকান্তি মজুমদার-এর বংশীবাদন দর্শকদের মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সহ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত।

বর্ধমানে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

৯ জুলাই বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বর্ধমান নগর শাখা বাদামতলা বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে উচ্চ মাধ্যমিকের পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীসহ স্নাতকোত্তর ও মাধ্যমিক ছাত্রদের সংবর্ধনা প্রদান করে। বিদ্যার্থী পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ যুগ্ম সম্পাদক অনিরুদ্ধ বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বর্ধমান জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ ডাঃ চিন্ময় দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবশ্রী ভট্টাচার্য।

পরলোকে জগদীশ হাজরা

গত ১৬ জুলাই জগদীশ হাজরা পরলোক গমন করেছেন। গত কয়েক মাস ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সঙ্ঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রয়াত জগদীশ বাবু স্ত্রী, এক কন্যা ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার ন্যাতরা গ্রামে তাঁর বাড়ী এবং সেখানেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। সঙ্ঘের ওই জেলার একদা ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে ক্রমে মজদুর সঙ্ঘের কার্যালয় সম্পাদক, রাজ্য কার্যকারিণীর সদস্য, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক এবং সভাপতি হন। তিনি সরকারি চাকুরিরত ছিলেন। বর্তমানে সোনারপুরে থাকতেন।

ট্র্যাকের মতো জীবনেও ছন্দবদ্ধ ইসিনবায়েভা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। নারী আজ আর শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে পড়ে থেকে দিনগত পাপক্ষয় করে না। তার চিন্তা-চেতনার পরিশীলিত সংস্কারে রচিত হচ্ছে একের পর এক "আইভরি কীর্তি"। মাউন্ট এভারেস্ট থেকে ভিন গ্রহে ভেসে বেড়ানো কোনও কিছুই তার কাছে অসম্ভব নয়। তারই মধ্যে এইসব তূরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান নারীকুল তাদের স্বভাবজাত স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনকে আরও মোহিনী করে ফুটিয়ে তুলতে কেতাদুরস্ত ফ্যাশনকেও জীবনের ঘনীভূত রূপ হিসেবে জুড়ে নিয়েছে অঙ্গসজ্জায়। আলোচ্য নিবন্ধে এমনই এক বিশ্ববিজয়ী, দুনিয়ার তামাম নারীর অনুপ্রেরণা রূপ রুশ ললনার কথা বলব, যার তুলনা কেবল তিনি নিজেই।

ইলিনা ইসিনবায়েভা, নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। অ্যাথলেটিক্সের কঠিনতম, কঠিনতম ইভেন্ট বলা হয় পোলভল্টকে, খ্যাতকীর্তি রুশ পুরুষ পূর্বসূরী সেগেই বুবকার মতো মেয়েদের পোলভল্টকে এক অন্য মাত্রা, অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন সুন্দরী ইলিনা। দু'বার অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন। বিশ্ব-খেতাব জিতেছেনও দুবার। ২৫ বার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন ও ভেঙেছেন। বয়স মাত্র ২৬, আরও কত উঁচুতে উঠবেন, তা সময়ই বলে দেবে। ইতিমধ্যেই অ্যাথলেটিক্স 'হল অব ফেমে' মর্যাদাব্যঞ্জক স্থান করে নিয়েছেন।

এজেনা ইলিনা ইসিনবায়েভা কিন্তু 'ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে'র মধ্যেই তাঁর জীবন সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী, আদ্যন্ত ফ্যাশন সচেতন ইলিনা দুনিয়ার কোটি কোটি পুরুষের চোখে ও মনে হিরন্ময় উদ্ভাস ও

ইসিনবায়েভা

আবেদনের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও ঝকঝকে তার ব্যক্তিত্ব। টানটান করে পনিটেলে বাঁধা চুল। বড় বড় দীঘল চোখে গাঢ় কাজল, নখে রঙবেরঙের নেলপালিশ। ফাইবারের পোল যখন আঁকড়ে ধরেন, দু'হাতের আঙুলে ঝকঝক করে সোনার আঙটি, অনেকটা স্বদেশীয় টেনিস সুন্দরী মারিয়া শারাপোভার মতো। দ্যুতিময় তাঁর সৌন্দর্য্য মিশ্রিত পারফরমেন্সের ঘনঘটা। তবে ইসিনবায়েভার ব্যক্তিগত জীবন খুবই গোপনীয়। অন্যান্য সুন্দরী ক্রীড়াবিদ্‌দের মত খুল্লাম খুল্লা জীবন দর্শনে বিশ্বাসী নন তিনি। ট্রাকেও অত্যন্ত রুচিশীল থাকে তার পরিধেয় বস্তুটি। মিডিয়ার লেন্সের সামনে নিজের অঙ্গ সৌন্দর্য মেলে ধরতে নিতান্তই অপারগ। সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথাবার্তাতে সপ্রতিভ। যে কোনওরকম উত্তেজনাপ্রবণ প্রশ্নের উত্তর বাকচাতুর্যে কাটিয়ে দেন। ট্রাকের বাইরেও তাঁর জীবনযাত্রা মাত্রাছাড়া নয়। কেতা দুরস্ত পোশাক পরতে ভালোবাসেন, তবে তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে না। সাজতে ভালোবাসেন, যা কখনই চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায় না। অন্যদের মতো ঘনঘন পুরুষ সঙ্গী পাল্টান না। তাঁর একজনই নির্ভরযোগ্য 'বয়ফ্রেন্ড' আছেন, যদিও তিনি 'সেলিব্রিটি' নন। আর তাঁর নামও কেউ জানে না, যেহেতু এই বিষয়ে সাংবাদিকদের কৌতূহল মেটাতে তিনি অপারগ। জীবনকে বৃহত্তর ক্যানভাসে পরতে পরতে রূপ, রঙ, ভাব ও মাত্রার আবহে গড়ে পিঠে নিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে স্থূল, রুচি বহির্ভূত কোনও কিছুই যে গুরুত্বহীন।

শব্দরূপ - ৫১৭

রূপালি মিত্র

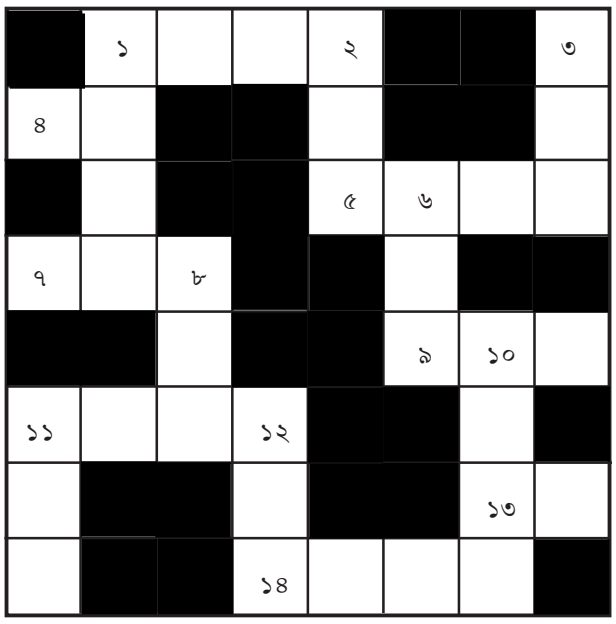

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. ভূমিকম্প, ৪. সৃজন, নির্মাণ, উৎপত্তি, ৫. আরবি শব্দে ব্যায়াম, কৌশল, কায়দা, শেষ দুয়ে নিযুক্ত, ৭. শুদ্ধ শব্দে অমানুষিক, ৯. বিশেষণে ভয়যুক্ত, ভীত, ১১. বেদব্যাস, পরাশর মুনির পুত্র, ১৩. বিশেষণে ভাঙ্গা, খণ্ডিত, ১৪. অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত নয়টি মানবিক, মধ্যে বিয়ের পাত্র।

উপর-নীচ ঃ ১. ধ্বংস, ছারখার, শেষ দুয়ে বিনাশ, ২. নুন, সল্ট, ৩. দেবতার কৃপা লাভের জন্য পুজো দেওয়ার সংকল্প, ৬. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম, ৮. একই শব্দে গোষ্ঠী, বাঁশ, কুল, ১০. অব্যয়ে ইঞ্জিন ইত্যাদি থেকে ক্রমাগত বায়ু নিঃসরণের শব্দসূচক, ১১. মীনা কুমারীর বিখ্যাত হিন্দি চলচ্চিত্র, ১২. দাঁত।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৫

■	■	ব	দ্ধ	জী	ব	■	বি
চা	ম	র	■	■	ল	■	দু
■	হা	■	ব	■	ক	বী	র
■	বৃ	শ্চি	ক	■	■	র	■
■	হ	■	■	পা	ন	সি	■
স	তী	ন	■	র্থ	■	ং	■
র	■	বি	■	মো	হ	ন্ত	■
মা	■	স	ত্যা	গ্র	হ	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ আগস্ট ২০০৯ সংখ্যায়।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

কুখ্যাত ১৩ জুলাই স্মরণে প্রতিবাদ কর্মসূচী জম্মুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ১৯৩১ সালের ১৩ জুলাই। জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসে একটা কালো দিন। সেই 'কালা দিবস'-এর খলনায়ক আব্দুল কাদের ও তার দাঙ্গাবাজ মুসলিমদের শহীদের মর্যাদা দিয়েছিল মুসলিম কনফারেন্স। এই মুসলিম কনফারেন্সই পরে ভোল বদলে হয় ন্যাশানাল কনফারেন্স।

এর বিরুদ্ধে গত ১৩ জুলাই প্রতিবাদে পথে নামেন কাশ্মীরি পন্ডিতেরা। জম্মুর প্রেস ক্লাবের বাইরে হাজার হাজার পন্ডিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। ওই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে দাবী ওঠে ১৩ জুলাইকে 'কালো দিবস' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। বাতিল করতে হবে তার 'শহীদ দিবস'-এর মর্যাদাকে।

কি ঘটেছিল আজ থেকে ঠিক ৭৮ বছর আগের সেই ১৩ জুলাইতে? সেই সময় আব্দুল কাদের নামে জনৈক যুবক পেশোয়ার থেকে কাশ্মীরে আসেন। এসেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথাবার্তা শুরু করেন পথে-ঘাটে। তাই কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় মুসলিমদের চাপে ১৯৩১ সালে ৮ জুলাই কাদেরের বিরুদ্ধে অভিযোগের পুনর্বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুসলিমদের বাধায় ওইদিন পুনর্বিচার করা সম্ভব হয়নি। এরপর ১৩ জুলাই 'পুনর্বিচার' পুনরায় আরম্ভ হলে, বিশাল মুসলিম জনতা জেল ভেঙ্গে বিচারস্থলে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে পুলিশ স্বভাবতই বাধা দেয়। ফলে মুহূর্তেই তা পরিণত হয় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায়। হাজার হাজার হিন্দু ঘর ছাড়া হন, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় হিন্দুদের বাড়ি। আসলে ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরে যে পন্ডিত বিতাড়ন সংঘটিত হয়েছিল, তার সূচনা কিন্তু ১৯৩১ সালেই। বলা যায়, '৩১-এর ট্রাডিশন অক্ষুণ্ণ ছিল' ৪৭ সালে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।

খেলার জগৎ

হাউটন আছেন হাউটনেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, বব হাউটন যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিজের জীবনদর্শন পাল্টাবেন না। যেনতেন প্রকারেণ ভারতের জাতীয় কোচের চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে। মাসে ৫ লাখ টাকা বেতন, পাঁচতারা হোটেলে দিনযাপন, বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে ইতি-উতি ঘোরাঘুরি — এত সুযোগ-সুবিধা কে আর হাতছাড়া করতে চায়। হাউটন বুঝে গেছেন তার কোচিং দক্ষতায় মরচে পড়ে গেছে। তাই কোনও উন্নত দেশ তাকে কোচ করবে না। অগত্যা ভারতকে ধরেই বাঁচতে হবে এবং সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে এই প্রৌঢ় বয়সে।

যথারীতি আগস্টের মাঝামাঝি যে নেহরু কাপ হতে যাচ্ছে, তাতে বিদেশী দলের লিস্ট থেকে মনে হওয়াই স্বাভাবিক এবারও ভারতের চ্যাম্পিয়ন হবার রাস্তা প্রশস্ত করাই হাউটন ও ফেডারেশনের লক্ষ্য। ভারতকে খেলতে হবে সিরিয়া, লেবানন, থাইল্যান্ডের মত মাঝারী শক্তির দলগুলির বিরুদ্ধে। গত দু'বছর নেহরু কাপ ও এ এফ সি চ্যালেঞ্জ কাপে ভারত জিতেছে এই ধরনের দলগুলির বিরুদ্ধে খেলে। মোটামুটি শক্ত প্রতিপক্ষ বলতে ছিল সিরিয়া, তুর্কমেনিস্তান ও উত্তর কোরিয়া। তাই আসন্ন নেহরু কাপকে পাখির চোখ করে বব হাউটন যা বুঝিয়েছেন ফেডারেশন কর্তাদের, সেই অনুযায়ী টিম আনা হচ্ছে। যাতে ফেডারেশনের কর্তাদের গদিও বাঁচে এবং বব হাউটনের এদেশে কোচিং জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বব কিছুতেই দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মুখোমুখি হতে চান না। বছরে এক আধবার এদের সঙ্গে খেলতে হয় ভারতকে প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপ বা প্রি -অলিম্পিকে। আর প্রতি ম্যাচেই ৪-৫ গোলের ব্যবধানে হার স্বীকার করতে হয়। আর এদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলে কী করে এশিয়ান ফুটবলের মূলস্রোতে উঠে আসবে ভারত? কবেই বা বিশ্বকাপ ও অলিম্পিকের মূলপর্বে খেলবে? লক্ষ্য হওয়া উচিত সুদূর প্রসারী। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে এগোনো উচিত। এই বোধটা কবে আসবে হাউটন ও ফেডারেশন কর্তাদের? তাতে হয়ত এখনই ব্যর্থতা কাটবে না, পরাজয় এড়ানো যাবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে এই সব টিমকে হারিয়ে অনেক বড় সাফল্য করায়ত্ত হতে পারে ভারতের। যেমন হয়েছে ক্রিকেটে সাম্প্রতিক কালে। আগে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা বলে বলে হারাতো ভারতকে। এখন ভারতও জিতছে এদের বিরুদ্ধে।

এদেশের কতিপয় ক্রীড়া সংস্কৃতিমনস্ক, ক্রীড়া উন্নয়ণকারী পত্র-পত্রিকা এই ব্যাপারটায় ফোকাস করে বারে বারে হাউটনের সমালোচনা করেছেন, এখনও করছেন। প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচেদের মধ্যে অনেকেই হাউটনের চালাকি ধরে ফেলে তাকে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু ফেডারেশন বা হাউটন কারুরই বোধোদয় হয়নি। তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেই কাজ করেন। এতে যে কত বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের, তা বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকেন এরা। আগে জিয়াউদ্দিন বা অশোক ঘোষের আমলে অনেক ভালভাল বিদেশী দল নেহরু কাপ খেলতে এসেছে। ভারতও তখন অনেক বেশি টুর্নামেন্ট খেলত। বড় ব্যবধানে হারলেও তখন কিন্তু ভারত মারডেকা সেমিফাইনালে খেলেছে।

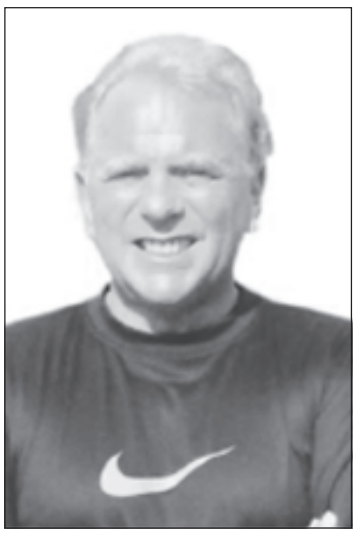

হাউটন

নেহেরু কাপে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের সঙ্গে তুল্যমূল্য লড়ে হেরেছে। পোল্যান্ড যুগোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ড্র করেছে। নিয়মিত বড় শক্তির টিমের সঙ্গে খেলার সুবাদে হীনমন্যতা কেটে গিয়ে অনেক বেশী আত্মপ্রত্যয় ও লড়াকু মানসিকতা নিয়ে খেলতে নামত ভারতীয়রা তখন। তাই তখন ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে একটা আগ্রহ ছিল জনমানসে।

অথচ এখন ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। ২০০৭-২০০৮-এ যে দু-দুটো টুর্নামেন্ট জিতল ভারত অথচ ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ জন্মায়নি দেশের যুব মানসে। সম্প্রতি ভারত স্পেনের বিশ্ববিখ্যাত বার্সিলোনা ক্লাবে অনেকদিন অনুশীলন করে এল। সেখানকার পরিকাঠামো ব্যবহার করে কতটা সমৃদ্ধ হল ভারতীয়রা সে সম্পর্কে কাগজে লেখালেখি হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও চর্চা বা আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি।

এর কারণ ভারত বছরে একটা টুর্নামেন্ট খেলে জেতে আর মাঝে মধ্যে বড় মাপের আসরে দু-তিনটি শক্তিশালী টিমের মুখোমুখি হয়ে হারে বড় ব্যবধানে। তাদের বছরে অন্তত ৩-৪টি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট খেলতে হবে। তাহলেই খবরের শিরোনামে থাকা সম্ভব। আর ভাল টিমের সঙ্গে খেলতে হবে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে।

একই সঙ্গে সিনিয়র টিমের সঙ্গে জুনিয়র ও সাব জুনিয়র টিমকেও তৈরি করতে হবে বিদেশে এক্সপোজার টুর্নামেন্ট খেলিয়ে।

প্রশি(ণরত এন এস জি কমাণ্ডো বাহিনী।

পশ্চিম উপকূলে আবার সন্ত্রাসী হামলার আশংকা

(১ পাতার পর)

গোয়েন্দা বিভাগের সতর্কতামূলক নোটটি দিল্লীতে উঁচুদরের সন্ত্রাসবাদী নেতা ও পাক নাগরিক মহম্মদ উমর মদনী ধরা পড়াতে আরও পুষ্ট হয়েছে। এছাড়া আমেরিকার শীর্ষ-স্থানীয় অফিসাররাও পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে নতুনভাবে হামলা চালানোর সম্ভাবনা প্রায় ৯০ শতাংশ বলে জানিয়ে দিয়েছেন। আর ভারতের সামরিক পরিকল্পনাকারীদের বক্তব্য, আবার হামলা হলে ভারত-পাক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

সরকারি পরিকল্পনা:

অথচ আরও একটি সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ করার মতো দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকাঠামোই এখনও গড়ে উঠেনি। যদিও ইউপিএ সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার আগে ১০০ দিনের মধ্যেই নিরাপত্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদেরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে চুপচাপ দেখা যাচ্ছে।

সাত মাস আগে ব্ল্যাক ক্যাটরা বিরুদ্ধ অবস্থায় লড়াই করেছে। দেখা গেছে আবশ্যকীয় বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের অপ্রতুলতা এবং অভাব। তাও সন্ত্রাসবাদীরা সংখ্যায় মাত্র আটজনই ছিল। একজন এন এস জি কমান্ডো দৃষ্টিশক্তি হারালেন। কেননা তার চোখে মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা দামের বিস্ফোরক নিরোধক চশমা বা চোখ রক্ষার সরঞ্জাম ছিল না। লড়াই করতে করতে পারস্পরিক কথাবার্তা চালানোর হ্যাণ্ড ফ্রি রেডিও পর্যন্ত ছিল না। তাদেরকে যে ওয়াকি টকি দেওয়া হয়েছিল তাও সাধারণ ব্যবহার্য, যার চার্জ থাকে মাত্র চার ঘন্টা। আজকের বর্তমান সময়েও দেখা যাচ্ছে বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপকরণ — কমব্যাট বুট, নী-প্যাড, চোখকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত বিস্ফোরক নিরোধক চশমা সংগৃহীত হয়নি বা বাহিনীর জওয়ানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। টেণ্ডারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে সরকার অযথা দীর্ঘ কালক্ষেপ করছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় এন এস জি হাব বা কেন্দ্র গড়ে তুলছে। কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনও নতুন সাজসরঞ্জাম দেওয়া হয়নি। শহরের বাইরে আক্রান্ত ক্ষেত্রে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও করা হয়নি। বিশেষত নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি, ডিজিটাল বেতার যন্ত্র, রাতের অন্ধকারে দেখার জন্য নাইট ভিশন ডিভাইস, রাতে হাতিয়ার দেখার উপকরণ, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং স্টান গ্রেনেডও প্রয়োজন। একজন এন এস জি মুখপাত্রের কথায়, শত অসুবিধা সত্বেও আমরা সদা সর্বদা প্রস্তুত। আমরা কখনও চাহিদার কথা নিয়ে আলোচনা করি না। ২৬।১১।০৮-এর তিনমাসের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রদপ্তর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ক্লীয়ারেন্স দিলেও তা আমলাতন্ত্রের বেড়া কোনও রহস্যজনক কারণে পার করতে পারেনি। এন এস জি-র ওয়েবসাইট অনুসারে এখনও বারোটি সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে পুনরায় টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

এই দীর্ঘসূত্রতার কারণ বারো দফা পদ্ধতির সিঁড়ি পার করতে ছয়মাস লাগে। গতবছরের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে হামলা ও বিস্ফোরণের পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর চারটি আধুনিক জলযান (Threat Containment Vessels) যা ১ টন ওজনের এবং বিস্ফোরক ধ্বংস করার ক্ষমতা সম্পন্ন এবং প্রতিটির দাম চারকোটি টাকা — ক্রয়ের জন্য অনুমোদন করেছিল। এন এস জি-র হাতে তা এখনও পৌঁছায়নি। কারণ, সেই দুর্বোধ্য আমলাতন্ত্র। এন এস জি-র প্রাক্তন ডি জি বেদ মারওয়ার কথায়, বিশেষ বাহিনী যদি বিশেষ সাজ-সরঞ্জাম না পায় তাহলে তাদের বিশেষ অবদানও সীমিত হবে।

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) ২৬।১১-র পর দ্রুত গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল দেশে সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনার তদন্ত করা। নানান কারণে এন আই এ এখনও থিতু হতে পারেনি। লোকবলও যা থাকার কথা তার তুলনায় অর্দ্ধেক — ডিরেক্টর রাধাবিনোদ রাজু সহ সাতজন আই পি এস অফিসারকে নিয়ে মাত্র ৪৫ জন।

লালফিতের ফাঁস :

দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে পি চিদাম্বরম্ সাহেব তিনটি কেস এন আই এ-র হাতে দেন। অসমের উগ্রপন্থী সংগঠন ডিমা হালাম দাওগা গোষ্ঠীর দুটি (সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম) এবং একটি জাল নোটের মামলা। এগুলোকে ঠিক সেরকম উচ্চ-পর্যায়ের মামলা বলা যায় না। উপকূলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারা যায়নি নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির পারস্পরিক সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে। স্পীডবোটের অভাব, উপকূলে ৮২টি থানা তৈরির পরিকল্পনা এখনও কার্যকর হয়নি। মার্চ '০৯ পর্যন্ত মাত্র ৬টি থানাই নির্মিত হয়েছে। মাত্র ১৩টি নতুন নৌকা এসেছে। জলপুলিশ এখনও সেই মাছধরা ট্রলারের উপরই নির্ভরশীল । অথচ, দীর্ঘ উপকূল এলাকায় পাহারা দিতে হবে, নজরদারি করতে হবে। ২৬।১১-র এতদিন বাদেও সহায়ক সরঞ্জামের অপ্রতুলতার কারণ কি?

রাউণ্ডে যাওয়ার মতো যথেষ্ট স্পীডবোট নেই। স্বরাষ্ট্রদপ্তর গোয়া এবং কলকাতায় সরকারি জাহাজ কারখানায় ১৬৮টি স্পীডবোটের বরাত দিয়েছে। তার মধ্যে ১২ টন ও পাঁচ টন ওজনের দ্রুত জলযানও আছে। ১৪ এপ্রিল '০৯ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ এবং তামিলনাড়ুতে নজরদারি নৌকা পাঠানো হয়েছে বলে খবর। ওগুলো পশ্চিম উপকূলে ৭৮টি প্রস্তাবিত মেরিন পুলিশ থানাতে কাজে লাগানো হবে। দুটি কারখানাই মাসে ছ'টি করে স্পীডবোট তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৬৮টি স্পীড বোর্ড সরবরাহ হতে আগামী বছর লেগে যাবে। কোস্ট গার্ডের একজন প্রবীণ অফিসার বলেছেন, উৎপাদনের গতি আশানুরূপ নয়, এটা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।

সমন্বয়ের অভাব :

আমাদের দেশে উপকূলের নিরাপত্তা দেখ-ভাল করে সব মিলিয়ে ১৫টি আলাদা এজেন্সি। এদের মধ্যে সমন্বয় ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য মেরিটাইম সিকিউরিটি উপদেষ্টা পদে নিযুক্তি একান্ত দরকার। ওই উপদেষ্টাই উপকূলের নিরাপত্তার ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। ২৬।১১ হামলার পরবর্তী সময়ে নৌবাহিনী এই বিষয়টা পর্যালোচনা করে সচিব এবং ভাইস এ্যাডমিরালের কানে তোলে। অথচ, এখনও ওই প্রস্তাব নিরাপত্তা সম্পর্কিত ক্যাবিনেট কমিটির কাছেই পৌঁছায়নি। এর কারণ কি? বিভাগীয় দ্বন্দ্ব। নৌবাহিনী চায় এম এস এ সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করুন, আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চান তাঁর সঙ্গেই প্রত্যক্ষ কথাবার্তা হোক।

নিরাপত্তার সব থেকে করুণ অবস্থাটা মুম্বাই পুলিশকে দেখলে ঠাহর করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের সেই এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে দিশাহীনভাবে দাঁড়িয়ে। আক্রমণের সম্ভাব্য শহরটাকে তারা পাহারা দিচ্ছে। অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। রাজ্য সরকার এক নম্বর ফোর্স গঠন করার ঘোষণা করেছে। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩৫০ জন জওয়ানকে নিয়ে একটি অ্যান্টি টেররিস্ট স্ট্রাইক ফোর্স গড়ার কথা বলেছে। কিন্তু এখনও জায়গার ব্যবস্থাই হয়নি। সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরের কাছে ২৫ একর জায়গা ফোর্স নম্বর-১ এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। পরে সেই জায়গা মুম্বাইয়ে এন এস জি হাব তৈরির জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুম্বাই পুলিশ কোণ্ট ত্ত-৪ (রিভলবার)-এর জন্য আবেদন জানিয়েছে যা আমেরিকায় তৈরি হয়। যদিও এ বিষয়ে এন এস জি অনেকরকম আপত্তি জানিয়েছে। তার মধ্যে এটা প্রচলিত আগ্নেয়াস্ত্রের অঙ্গীভূত নয়। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সাবধান বাণী হল, বিভিন্ন পুলিশ মহল তাদের জন্য বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ও যন্ত্রপাতি কিনতে চাইছেন সেনা বা এন এস জি-র সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই, এটা ঠিক নয়। মুম্বাই পুলিশ এখন ৯০০টি নতুন বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট কেনার ব্যাপারে ধীরে চলার নীতিগ্রহণ করেছে। এখনও পর্যন্ত তারা তিনটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি এবং ১২০টি মোটর সাইকেল হাতে পেয়েছে। মুম্বাই উপকূলে মাত্র ছটি পুলিশ থানা স্থাপন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষে কাজ শুরু করেছে মাল্টি এজেন্সি সেন্টার। সেন্টারের কাজ হল বাইশটি গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় এবং সংবাদ আদান-প্রদান করা। গত সাতমাসে এটা নতুন করে শুরু হয়েছে। তবে, বেশীর ভাগ গোয়েন্দা সংস্থাই এই প্রথমবার তথ্য আদান-প্রদান শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার খবর পেয়েছে এবং ঠিক জায়গামতো সতর্কবার্তা পাঠিয়েও দিয়েছে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর কাছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে ৩০টি সহযোগী মাল্টি এজেন্সি সেন্টার খুলেছে। মাল্টি এজেন্সি সেন্টার স্থাপনই একমাত্র আলোর রেখা, যা না হলে গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদান সম্ভবই হতো না।

টার্গেট দক্ষিণ :

সন্ত্রাসবাদীদের কাছে সব থেকে পছন্দ এবং সফট্ টার্গেট অবশ্যই সফট্ওয়্যার নগরী ব্যাঙ্গালোর। ভারতের তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্র থেকে আসা সর্বমোট রেভেনিউর চল্লিশ শতাংশই ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছে বলে গত অর্থবছরে দেখা গেছে। শহরের বিভিন্ন বাড়ীতে ১,৫০০ আই টি সংস্থার কর্মী সংখ্যা দু'লক্ষের মতো। এখানে যেকোনও আক্রমণই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ। বিগত চার বছরে দুটো সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং বার বার টার্গেট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে ভারতের সিলিকন ভ্যালির। গত বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আঁটোসাটো করার জন্য ৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য পুলিশের আধুনিকীকরণের যোজনা গৃহীত হয়েছে। শুধু ব্যাঙ্গালোর-এর জন্য ১০০টি জি পি এস সুবিধাযুক্ত পুলিশ জীপ এবং উপকূল ও নকশাল প্রভাবিত এলাকার জন্য আরও ৫০০টি বাহন বৃদ্ধি করার কথাও আধুনিকীকরণ পরিকল্পনাতে রয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ বিভাগ ও স্থায়ী রিলিফ টীমের কথা বলা হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

নগর পুলিশের ডগ স্কোয়াডে যে সব স্নিফার ডগ রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণ যে পর্যন্ত তাতে তারা 'জিলেটিন'-এর সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু আরও আধুনিক বিস্ফোরকের ছত্মড্ডদ্ধ জাতীয়) সন্ধান দেওয়ার প্রশিক্ষণ তাদের নেই। গত ৩১ মে রাজ্যের অ্যান্টি টেররিস্ট সেলের প্রধান অবসর নেওয়ার পর তাঁর জায়গা এখনও খালি রয়েছে। অথচ নিরাপত্তা এজেন্সিরা গত এক দশক ধরে শহরেই অনেক স্লিপার সেল কাজ করছে বলে সতর্ক করেছে। এমনকী সন্ত্রাসবাদীরা 'বিধান সৌধ'-কে টার্গেট করছে বলে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছে।

গত মাসেই ব্যাঙ্গালোর শহর পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্য বিধানসভাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করতে ৫১ দফা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বিধানসভা ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কোনও বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি যাতে ঢুকতে না পারে সেজন্য গাড়ি পরীক্ষা করার যন্ত্র (Vehicle Scanner) বসানোরও প্রস্তাব রয়েছে। যেভাবে সরকারি কাজকর্মের ধারা তাতে সত্বর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যা সব করা দরকার তার লক্ষণই চোখে পড়ছে না। হয়ত আরও একবার আক্রমণ হওয়ার পরই সব নড়ে চড়ে বসবে।

Swastika
3 August - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

বাজল তোমার আলোর বেণু

প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে কুমোরটুলিতে

অর্ণব নাগ ।। ধরুন, কোনও ক্যুইজের রিয়েলিটি শো'তে আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, আচ্ছা বলুন তো, পুজো মানে দুর্গাপুজো যে আসছে, তা আপনি ক্যালেন্ডারের দিকে না তাকিয়ে বুঝবেন কীভাবে? প্রশ্নটা ভাল করে খেয়াল করুন, ক্যালেন্ডারের দিকে কিন্তু তাকাতে পারবেন না আপনি, মানে দিনক্ষণ বোঝার উপায় নেই। তো আপনি নিশ্চয়ই বলে বসবেন, এ আর না বোঝার কি আছে? শরতের পরিচ্ছন্ন আকাশে পেঁজা পেঁজা সাদা মেঘ, কাশফুল দেখলেই তো বিলকুল বোঝা যায় পুজো এসে গিয়েছে। উত্তরখানা দিয়ে আপনি মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই পারেন, যাক্ রিয়েলিটি শো'য়ে এ যাত্রা অন্তত মাৎ করে দেওয়া গেছে। না মশাই, উত্তরটা মোটেও ঠিক হয়নি, এযাত্রায় আপনার নম্বর বিগ জিরো। এবার নিশ্চয়ই চটে লাল হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? সঠিক উত্তরটা তবে কি? সেটা জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে কুমোরটুলিতে। কারণ, বিশ্ব উষ্ণায়ণের যুগে পুজোর আগে শরৎকালেই এখন যত বৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং পরিষ্কার আকাশ তো দূরের কথা বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারকেই বেশি করে মনে পড়বে। আর এই জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় কাশফুল-টাশফুল এখন দেখাই ভার।

যাকগে, আসছেন তো কুমোরটুলিতে? আসার আগে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসের সন্ধান করতে পারেন। শোভাবাজার থেকে উত্তর অভিমুখে সোজা নাক বরাবর হাঁটতে থাকলে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ-এর ওপর বাঁদিকে দেখবেন কমলা রঙের গ্লোসাইন বোর্ডের ওপর সাদা অক্ষরে বড় করে লেখা রয়েছে 'নবীন চন্দ্র দাস, ইনভেন্টর অব্ রসগুল্লা'। কলকাতার বিখ্যাত রসগোল্লার সৃষ্টিকর্তা এরাই। যাই হোক, কুমোরটুলিতে ঢোকার আগে দু'চার পিস টেস্ট করে দেখলে নেহাত মন্দ হবে না। ট্রাডিশ্যানাল রসগোল্লা থেকে বিখ্যাত কলকাত্তাইয়া স্পঞ্জ রসগোল্লা সবই মিলবে এখানে। খেয়ে-দেয়ে ঢুকে পড়ুন

মদনমোহনতলায়। এই রাস্তাটি পেরোলেই ট্রামলাইন আর তারপরেই কুমোরটুলি। এবার আসি ক্যুইজের দ্বিতীয় প্রশ্নে। বলুন তো, ওখানে ট্রামলাইন যদি না থাকত তবে বুঝতেন কি করে এটা কুমোরটুলি। আপনার যদি জিন্দেগীতে কুমোরটুলি যাবার অভিজ্ঞতা না থাকে তবে এর উত্তর দেওয়া আপনার কম্ম নয়। অগত্যা উত্তরটা এই প্রতিবেদকই দিচ্ছে। মদনমোহনতলা স্ট্রীটের একদম শেষপ্রান্তে পৌঁছনো মাত্র গঙ্গার শীতল সমীরণ প্রখর তপন তাপেও আপনার প্রাণ জুড়িয়ে দেবে। বুঝবেন কুমোরটুলি একেবারে সমীপে।

এবার আপনি এসে গেলেন কুমোরটুলিতে। বাংলার প্রতিমা তৈরির শ্রেষ্ঠ কারিগর 'পাল রাজা'দের রাজত্ব এখানেই। অবশ্য পালদের সেই গরিমা এখন প্রায় অস্তমিত, বর্তমানে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের মানুষের মুখে অন্ন যোগাচ্ছে এই কুমোরটুলি। গঙ্গার ধারে সার সার দিয়ে গড়ে উঠেছে বাঁশ ত্রিপলের কুঁড়েঘর। রয়েছে দু-মহলা, তিন-মহলা কিছু বনেদী বাড়িও। একদিকে সপরিবারে মানুষ বাস করছে ওই ঘরগুলিতে, পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে প্রতিমাও। সরকার চেষ্টা করছে পুনর্বাসন দেওয়ার। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সেই পুনর্বাসন স্থল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। কিন্তু অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। প্রতিমা শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, তাঁরাও চান না বহু শতকের ঐতিহ্যবাহী স্থানটিকে ছেড়ে এখনই অন্যত্র কোথাও সরে যেতে।

পুজোর আগমনী গান প্রথম শোনা যায় এই কুমোরটুলিতেই। পুজো আসার প্রায় মাস তিনেক আগেই ফাইবারের প্রতিমা জাহাজে করে পাড়ি জমায় টেক্সাস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিসের উদ্দেশ্যে। পুজোর মাস দেড়েক আগে উড়োজাহাজে বিদেশে পাড়ি দেন মা দুর্গা। কুমোরটুলি ঘুরে দেখা গেল ফাইবারের প্রায় সব প্রতিমা ইতিমধ্যেই বিদেশের পথে। এখন সেখানে বারোয়ারী পুজোর প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। এই প্রতিমা পৌঁছে যাবে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র। প্রতিমা শিল্পী লক্ষণ পাল জানালেন, প্রায় ষাট শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁদের। তবে বৃষ্টি নিয়ে যখন হাহুতাশ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, তখন কিন্তু দিব্যি আরামে আছেন লক্ষণবাবুরা। জানালেন, 'কুমোরদের বৃষ্টির দরকার নেই'। আসলে প্রতি বছর পূর্ত দপ্তরের অকর্মণ্যতার জন্যে রাস্তায় জল জমে জীবন দুর্বিসহ করে দেয় প্রতিমা-কারিগরদের। তাছাড়া, জোলো আবহাওয়ায় প্রতিমা শুকোতে বড্ড দেরী হয়, সেই সঙ্গে ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে বর্ষার জল গলে ঘর ভাসানোর ভয়ও আছে। রথযাত্রা কিংবা জন্মাষ্টমীর দিন ব্রাহ্মণ দিয়ে নিষ্ঠাভরে কাঠামো পুজো করে শুরু হয় গেরস্থ বনেদী বাড়ির ঠাকুর তৈরির কাজ। তাঁদের কথায় 'জন্মাষ্টমীর পর আর দম ফেলবার ফুরসৎ থাকে না।'

কুমোরটুলিকে ছোট-খাটো জ্ঞান-ভান্ডার বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। গিয়ে দেখলাম, প্রায় গোটা চারেক পর্যায়ে প্রতিমা তৈরি হয়। প্রথম পর্যায় হলো 'খেলানো' মানে কাঠ-টাঠ ও খড় দিয়ে জবরদস্ত একটা কাঠামো তৈরি করা। দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় 'একমেটে' মানে এঁটেল বা দোঁয়াশ মাটি ও ধানের তুষ মিশিয়ে ওই কাঠামোয় প্রথম কোট (আবরণ) দেওয়া। তৃতীয় পর্যায় হল 'দোমেটে', মানে বেলেমাটির আবরণ দিতে হবে ওর ওপর। সেই সাথে গরমে বেলে মাটিতে ফাটল ধরলে স্থানীয় কারিগরদের ভাষায় 'ন্যাতাঘষা' মানে ভিজে ন্যাকড়া দিতে হবে। চতুর্থ পর্যায় হলো, প্রতিমার চক্ষুদান ও রঙ করা। প্রতিমা শিল্পীরা জানালেন, প্রতিমার গোলমুখের তুলনায় বাংলামুখের চাহিদা এবার খুব বেশী। তাঁদের বক্তব্য, মা'র সনাতন বঙ্গের বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা মুখের প্রতিচ্ছবি ফোটাতে কালঘাম ছোটে শিল্পীদের, সেইদিক দিয়ে গোলমুখের রূপদান করা অনেক সহজ।

কুমোরটুলির শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় জানা গেল। এবার নাকি থিম পুজোর একদম চাহিদা নেই, সবাই চাইছে ট্রাডিশ্যানাল পুজোই করতে। এতে বেজায় খুশী কুমোরটুলির মৃৎ-শিল্পমহল। কারণ কারিগরদের দুঃখ, থিম পুজোর পুরো রসদটাই চলে যায় আর্টিস্টদের পকেটে। পকেটে টান পড়ে কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীদের। তাঁদের খেদোক্তি, 'আমরা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে এলেও কেউ পুঁছবে না। পুজোর উদ্যোক্তারা মনে করেন, এই আদুড় গায়ে লুঙ্গি পরা কারিগরদের তুলনায় ঝোলা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, লম্বা চুলের আর্টিস্টরা অনেক ভালো আঁকতে পারেন।'

এই খুশীর রেশ পড়েছে যাঁরা প্রতিমার বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম, গয়না-গাঁটি তৈরি করেন তাঁদের মধ্যেও। সেই বাজারে ঘুরে দেখা গেল হরেক কিসিমের জিনিসপত্র যেমন প্রদীপ চুমকি, বাটি চুমকি, কার্গিল ফুল, নোলকপুঁথি, স্টোন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিমার মুকুট। দোদলাই লেস, কাংনি, শর্মা সুতো, চারলাইনপাড় ইত্যাদি বিচিত্র বিচিত্র সব নামের দ্রব্যাদি দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিমার গয়না।

রাখাল পাল, মোহনবাঁশী রুদ্র পাল, অসুস্থ শয্যাশায়ী নেপাল পাল, অলোক সেনদের সার্থক উত্তরসূরীদের কর্মতৎপরতার কুমোরটুলি এখন মুখর মা'র আগমনী গানে।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com